رسائل توجيهية

জীবন নির্দেশিকা

باللغة البنغالية

জীবন নির্দেশিকা

সংকলন

জ্ঞান-গবেষণা বিভাগ

দারুল অরাকাত আল-এলমিয়া প্রকাশনী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শামাউন আলী

সম্পাদনা

জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

ও

শেখ মুহসীন আলী

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القسم العلمي بالدار

رسائل توجيهية./ القسم العلمي بالدار؛ محمد شمعون علي.- الرياض ، ١٤٢٥هـ

١٠٠ ص، ١٢ × ١٧ سم

(النص باللغة البنغالية)

ردمك: ١ - ٥ - ٩٥٤٩ - ٩٩٦٠

١- الاخلاق الإسلامية أ. علي، محمد شمعون (مترجم)

ب- العنوان

ديوي ٢١٢,٢ ١٤٢٥/٣٢٧٦

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٣٢٧٦

ردمك: ١ - ٥ - ٩٥٤٩ - ٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত আদর্শ নেতা হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবাদের উপর।

আজ সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ঈমানী দুর্বলতা, আমলের ত্রুটি ও গাফলতী। সুতরাং সকলের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে ঈমানের সঠিক শিক্ষা ও চেতনা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। কিন্তু অনেকে অজ্ঞতার জন্যে তাওহীদের নামে শির্ক, ইসলামের নামে কুফরী এবং সুন্নতের নামে বিদআত করছে। রিয়াদ শহরের শাফা এলাকায় অবস্থিত, 'ইসলামী দাওয়াত ও নির্দেশনা সহযোগী অফিস' বিভিন্ন ভাষায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ঈমান ও ইসলামের সঠিক তাৎপর্য মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের সামনে তুলে ধরার কাজ করছে। বাংলা ভাষায়ও ইতিমধ্যে বেশ কিছু বই-পুস্তক ও লিফলেট প্রকাশ করেছে এবং তা পাঠক মহলে ব্যপক সমাদৃত হয়েছে। এই বইটি আরবী কয়েকটি লিফলেট একত্রিত করে **رسائل توجيهية** নামে সংকলিত বইটির অনুবাদ 'জীবন নির্দেশিকা' নামে প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন, ঈমান ও ইসলামের দাবী অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আমীন ॥

সূচীপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিসাব দেয়ার পূর্বেই নিজের হিসাব করুন

প্রিয় মুসলিম ভাই !

আপনি কি কোন দিন একান্তে নিজের হিসাব করেছেন। আজ কি কাজকর্ম করেছেন এবং কি কথাবার্তা বলেছেন ? আপনি কি কোন দিন আপনার গুনাহ্ ও নেকীর হিসাব করে দেখেছেন ? আপনি কোন দিন এমন কোন নেকীর কাজ্র করেছেন যার জন্য গর্ব করতে পারেন ? আপনি যদি দেখেন যে, এর অধিকাংশই লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতায় পরিপূর্ণ, তাহলে আপনার পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিৎ ! কেননা আপনার ঘাড়ে গুনাহ্ ও পাপের বোঝা চেপে আছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝١٨ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝١٩ ﴾ (سورة الحشر)

"(১৮)হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রতেকেই ভেবে দেখ যে, আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত। (১৯)আর তোমরা তাদের মত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো, যার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন"। (আল-হাশর)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾ (الزمر)

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসো এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না"। (আল-যুমার : ৫৪)

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন ঃ

"حَاسِبُواْ أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواْ وَزِنُواْ أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُواْ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىْ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وَتَزَيَّنُواْ لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُوْنَ لاَ يَخْفَىْ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ"

'তোমরা হিসাব দেয়ার পূর্বেই নিজেদের হিসাব কর। তোমরা নিজেদের পরিমাপ কর তোমাদের পাপ-পূণ্য ওজনের পূর্বেই। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজের অবস্থা পরিমাপ করে দেখবে কিয়ামত দিবসের হিসাব তার জন্য সহজ হবে। আর কিয়ামত আসার আগেই সবকিছু গুছিয়ে নাও ! সেদিন কোন কিছুই গোপন থাকবে না'। (তিরমিযী, মুসান্নাফে আবী শাইবাহ)

ইবাদত ও আল্লাহ্ ভীতি

আল্লাহ্ তাঁর অনুগত্যকারী বান্দাদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ

يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ (المؤمنون)

"(৫৭)নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত (৫৮)আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে (৫৯)এবং যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০)তারা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৬১)তারাই দ্রুত কল্যাণকরকাজ সম্পাদন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী" (সূরা আল-ম'মিনুন)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন ঃ আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ; এআয়াতের আলোকে যারা মদ পান করে, জিনা-ব্যাভিচার ও চুরি করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ "না, হে সিদ্দিকের কন্যা ! বরং যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, দান-সাদকাহ করে, তারপরও ভয় করে যে, হয়তোবা তাদের আমল কবুল নাও হতে পারে। আর এজন্যেই তারা দ্রুততার সাথে বেসী বেসী কল্যাণ কাজ করতে থাকে"।(তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ)

হে মুসলিম ভাই !

সম্মানিত সালফে সালেহীনগণ এভাবেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ কাজে দ্রুত এগিয়ে আসতেন। আর যেকোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং এই ভেবে ভয়ে ভীত থাকতেন যে, হয়তোবা তাদের আমল আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহ্বা ধরে বলতেন এই

আমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি অনেক কান্নাকাটি করতেন এবং বলতেন, তোমরা কান্নাকাটি কর। যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভান কর। তিনি বলতেন, যদি আমাকে কোন গাছ হিসেবে সৃষ্টি করা হতো আর তা কেটে ফেলা হতো, তাহলে কতইনা ভাল হতো।

হযরত উমর (রাঃ) সূরা তুর পড়ার সময় যখন এ আয়াতে গিয়ে পৌছতেন "নিশ্চয় আপনার প্রভুর আযাব অবশ্যভাবী।" (তুর ঃ ৭) তখন তিনি খুবই কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন, যার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন, লোকজন তাঁকে দেখতে আসতো। তিনি রাতে কুরআন পড়ার সময় খুব কাঁদতেন, যার ফলে দুই গালে কাল দাগ পড়ে যেতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনার দ্বারা বড় বড় শহর বিজিত হয়েছে,, অনেক দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়েছে এবং আপনি ইসলামের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছেন (এরপরও এত চিন্তা কিসের?) তখন হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি যদি কোনভাবেও মুক্তি পাই সেটাই কামনা করি। আমার যেন কোন নেকীও না থাকে এবং গুনাহও না থাকে।

হযরত উসমান (রাঃ) কবরের পাশে দাড়ালে ভীষণ কান্নাকাটি করতেন, যার ফলে তাঁর দাঁড়ি মুবারক ভিজে যেত। তিনি বলতেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থান করছি, জানিনা আমার ব্যাপারে কোনটির নির্দেশ দেয়া হবে। এটা জানার পূর্বেই যদি

ছাইভস্মে পরিণত হতাম তাহলেই ভাল হতো!

হযরত আলী (রাঃ) অনেক কাঁন্নাকাটি করতেন এবং আল্লাহকে বেশী বেশী ভয় করতেন আর নিজের আমলের হিসাব কষতেন। তিনি দুটি বিষয়কে বেশী ভয় করতেন (১) বেশী আশা-আকাঙ্খা এবং (২) কুপ্রবত্তির অনুসরণ। তিনি বলেন ঃ বেশী আশা আকাঙ্খা পরকালকে ভুলিয়ে দেয় এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হক পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করে।

অন্তঃকরণে আল্লাহর পথে চালিকা শক্তি

হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ মহান আল্লাহ সহজ সরল পথের উদাহরণ পেশ করেছেন। সরল পথের দুই পাশে বেড়া দেয়া রয়েছে। এতে অনেক খোলা দরজা রয়েছে। এই খোলা দরজাগুলোর উপর পর্দা টাঙ্গানো আছে। রাস্তার উপর একজন আহবানকারী ডাক দিয়ে বলছে ঃ হে লোক সকল! তোমরা সকলে রাস্তা দিয়ে চল কিন্তু এদিক সেদিক যেয়ো না। রাস্তার উপর আরো আহবানকারী রয়েছে তারা এসব দরজার কোনটি খুলতে চাইলে বলে, কি সর্বনাশ! তুমি ওটা খোলোনা। তুমি যদি ওটা খুলো তাহলে তাতে ঢুকে পড়বে। সুতরাং পথ হল ইসলাম। পর্দা হল আল্লাহর দেয়া সীমারেখা আর খোলা দরজা সমূহ হলো, হারাম বস্তু সমূহ এবং উপর থেকে আহবানকারী হলো প্রত্যেক মুসলমানের অন্তঃকরণে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ দাতা। (আহমাদ, হাকেম, শায়খ আলবানী

হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।)

হে মুসলিম ভাই! আপনি কি আপনার অন্তরে আল্লাহর উপদেশ দাতার ডাকে সাড়া দেবেন না? আল্লাহর দেয়া সীমারেখা এবং হারামের সংরক্ষণ করবেন না? আপনার ও আল্লাহর শত্রু শয়তানের উপর বিজয়ী হবেন না? মহান আল্লাহ বলেন ঃ "নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গণ্য কর। সেতো আহ্বান করে যেন তোমরা তার অনুসারী হও।" (ফাতির ঃ ৬)

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বান্দার মুখমন্ডলে দু'টি চোখ রয়েছে যা দ্বারা সে দুনিয়ার সবকিছু দেখে থাকে এবং তার অন্তঃকরণে দুটি চোখ রয়েছে যা দ্বারা সে পরকালে বিষয় দেখে থাকে। আল্লাহ যদি কোন বান্দার জন্য কল্যাণ চান তাহলে তার অন্তরের চোখ দু'টি খুলে দেন, যার ফলে সে আল্লাহর ওয়াদাকৃত গায়েবের বিষয় দেখতে পায়। আর অন্য কিছু চাইলে তাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেন। অতপর তিনি পাঠ করেন ঃ "তাদের অন্তঃকরণের উপর কি তালা রয়েছে।" (মুহাম্মদ ঃ ২৪)

মুহাসাবার ব্যাপারে কতিপয় বাণী

১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর কতিপয় কর্মচারীর নিকট লিখেন ঃ তুমি তোমার নাফসকে সুখের সময় হিসাব করো কঠিন সময়ে হিসাব দেয়ার পূর্বেই। কেননা কঠিন সময়ে হিসাব দেয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি সুখের সময় নিজের নাফসের হিসাব নেবে

তার বিষয়টি সন্তোষজনক হবে। আর যাকে তার জীবন ভুলিয়ে রাখবে এবং কামনা বাসনায় ব্যস্ত রাখবে তার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আফসোস ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে।

২. হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ একজন অবশ্যই তার নাফসের হিসাব নেয় এ বলে যে, তুমি কি করতে চাও? কি খেতে চাও? কি পান করতে চাও। আর পাপী সামনে এগিয়ে চলে, নিজের নাফসের কোন হিসাব নেয় না।

৩. হযরত কাতাদাহ্ মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাপারে বলেন ঃ

«وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا »۔ (الكهف : ٢٨)

অর্থাৎ যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা।" (কাহাফ ঃ ২৮) সে নিজের জীবনকে ধ্বংস করছে। নিজের মালামালের হেফাজত ভালভাবেই করছে কিন্তু নিজের জীবনকে ধ্বংস করেছে।

৪. হযরত হাসান বলেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর রয়েছে যতক্ষণ তার মাঝে উপদেশ দাতা নফস রয়েছে এবং তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবা করা।

৫. মায়মুন ইবনে মাহ্‌রান বলেন ঃ বান্দা ততক্ষণ মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যবসায়িক পার্টনার তার পার্টনারের যেভাবে হিসাব নেয় তার চেয়েও বেশী করে তার নাফসের মুহাসাবা করবে। এজন্যেই বলা হয়েছে যে, নাফস হচ্ছে খিয়ানতকারী

অংশীদার বা পার্টনারের মত। যদি তুমি তার সাথে হিসাব নিকাস না করো তাহলে সে তোমার সব মালই আত্মসাত করে ফেলবে।

৬. ইমাম আহমাদ ওহাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আলে দাউদের হিকমতে লেখা ছিল ঃ জ্ঞানবান ব্যক্তির উচিৎ যেন সে চারটি মুহূর্ত সম্পর্কে উদাসীন না থাকে। (১) তার প্রভুর সাথে একান্তে আহ্বানের সময়, (২) যে মুহূর্তে সে তার নিজের আত্মসমালোচনা করে, (৩) সে মুহূর্তে যখন সে তার ভাইদের সাথে বসে, যারা তার দোষক্রটি ধরিয়ে দেয় এবং (৪) যখন সে নিজের নাফস ও তার কামনা বাসনার বস্তুর সাথে একান্তে থাকে। কেননা এ মুহূর্তটি তাকে অন্যান্য মুহূর্ত সম্পর্কে সজাগ থাকতে সাহায্য করবে।

৭. হযরত আহনাফ বিন কায়স (রহঃ) চেরাগের উপর আঙ্গুল রেখে বলতেন, হে আহনাফ তুমি এখন মজা চাখ, উমুক দিন কি করেছিলে? উমুক দিন উমুক মুহূর্তে কি করেছিলে?

৮. হাসান বলেন ঃ একজন মুমিন নিজের নফসের উপর পর্যবেক্ষণকারী, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিজের হিসাব নেবে। কিয়ামতের দিন সেই সম্প্রদায়ের হিসাব সহজ হবে যারা দুনিয়াতে নিজদের হিসাব করেছিল। আর কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাব হবে যারা দুনিয়াতে হিসাবের ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি। একজন মুমিন কোন কিছু দেখে আকৃষ্ট হলে বলে আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে চাই, তুমিই আমার কামনা বাসনা। কিন্তু আল্লাহর শপথ!

তোমার নিকটতো আমি পৌছতে পারছিনা। তোমার ও আমার মাঝে বিরাট আড়াল রয়েছে। এরপর নিজের নাফসের দিকে লক্ষ্য করে বলে, কেন তুমি তা চাইছিলে? এর সাথে আমার সম্পর্ক কি? আল্লাহর শপথ! কক্ষণো আর এদিকে মুখ ফিরাবো না।

মুমিনেরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে কুরআন পথিমধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ও তাদের ধ্বংসের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন মুমিন প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়ায় একজন বন্দীর মত, যে তার বন্ধন খুলতে সচেষ্ট। সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। সে ভালভাবেই জানে যে, তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবন শক্তি ও কথাবার্তা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

৯. মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই বান্দার উপর রহম করুন, যে তার নফসকে বলে, তুমি কি এটা করনি? তুমি কি ওটা করনি? এভাবে তাকে বকাবকি করে কুরআনের অনুসারী হতে বাধ্য করে। যার ফলে সে নাফসের চালকে পরিণত হয়।

১০. ইবনে আবী মুলায়কা বলেন, আমি রাসূলের (সঃ) এমন ৩০ জন সাহাবীকে পেয়েছিলাম, যারা সকলেই নিজেদের ব্যাপারে মুনাফেকীর আশংকা করতেন। তারা কেউই বলতে পারতেন না যে তারা খাঁটি ঈমানদার!!

হে মুসলিম ভাই!

ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো মানুষ তার টাকা পয়সায় জালনোট যেন ঢুকে না যায় এ ব্যাপারে কত সচেষ্ট, আর জালিয়াতীকারীরা নির্ভয়!! দেখুন হযরত আবু বকরকে (রাঃ) তিনি তার জিহ্বা ধরে বলেন ঃ এটিই আমার সর্বনাশ করছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে হুজায়ফা! আমি কি মুনাফেকদের অন্তর্গত!!

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সাহাবাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে দেখতে পাবে যে, তারা আমলের দিক দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিলেন। সাথে সাথে তারা ছিলেন আশংকার দিক দিয়েও চূড়ান্ত পর্যায়ে। হয়তবা তাদের আমল কবুল হবে না ভেবে।

আমরা আমলের ক্ষেত্রে কত অবহেলা করছি। আর শেষ পরিনতির ব্যাপারে কোনই পেরেশানি নেই। এ যদি হয় ইমাম ইবনুল কাইয়্যুমের যুগের কথা, তাহলে আমাদের ব্যাপারে বর্তমান যুগে আমরা কি বলব?

হে প্রিয় ভাই, আপনি আপনার সময়কে নষ্ট করবেন না। কারণ, এ টিই হচ্ছে আপনার পুঁজি। যদি আপনি আপনার পুঁজিকে সংরক্ষণ করতে পারেন তাহলেই না লাভ হবে। আজকে আপনার পরকালের সওদায় মন্দা ভাব। এই মন্দাভাবের সময় আপনি আপনার সওদা গুছিয়ে নিন। কারণ, মন্দাভাব কেটে গেলেই তেজিভাব শুরু হবে।

তখন আর সহজে সওদা সংগ্রহ করতে পারবেন না।

আত্মসমালোচনার প্রকারভেদ ঃ

আত্মসমালোচনা দুই প্রকার। এক ঃ কাজ শুরু করার পূর্বে। দুই ঃ কাজ সম্পাদনের পর।

প্রথম প্রকার ঃ কাজ শুরুর পূর্বেই ভালভারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন কাজটা করা সঠিক হবে কিনা। হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি করুণা করেন, যে কাজ শুরু করার পূর্বে চিন্তা করে দেখে। যদি কাজটি আল্লাহর ওয়াস্তে হয় তাহলে সম্পাদন করে। আর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ কাজ সম্পদানের পরে আত্মসমালোচনা করা। তা তিন প্রকার। এক ঃ কোন নেকির কাজ করার পরে আত্মসমালোচনা করে দেখা, কাজটি কি সঠিকভাবে হয়েছে নাকি এতে গাফলতি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন কমতি না পড়ে তার জন্য সংকল্প করা।

দুইঃ প্রত্যেকটি কাজের হিসাব নেওয়া, যেটা না করাই ভাল ছিল। তিনঃ আত্মসমালোচনা করা সে কাজের, যে নেকির কাজটি করা হয়নি। নিজকে এভাবে প্রশ্ন করা যে, সেকি পরকালের কল্যাণ চায়, নাকি দুনিয়া লোভী। এ ভাবেই নিজেকে পরকালমুখি করে লাভাবান হবেন।

আত্মসমালোচনা করতে সহায়ক কর্মকান্ড ঃ

কতিপয় কাজ রয়েছে যা মানুষকে আত্মসমালোচনা করতে সহায়তা করে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১। একথা ভালভাবে উপলদ্ধি করা যে, আজ নিজের আত্মসমালোচনা করা হলে ভবিষ্যতে কাজ করা সহজ হবে। আর আজকে যদি আত্মসমালোচনা করতে ঢিল দেয়া হয়, তাহলে পরবর্তীতে তার হিসাব দেয়া কঠিন হয়ে যাবে।

২। এ কথা ভালভাবে জানা যে, আত্মসমালোচনার ফলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে, আল্লাহর দিদার লাভ, নবী ও নেককারদের সাহচর্য লাভ ভাগ্যে জুটবে।

৩। আত্মসমালোচনা পরিত্যাগ করলে কি ক্ষতি হতে পারে এবং তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে চিন্তা করা।

৪। সে সব লোকের সঙ্গ লাভ করা যারা আত্মসমালোচনা করে নিজেদেরকে সংশোধিত করে এবং খারাপ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

৫। আমাদের সালফে সালেহীনদের জীবন-চরিতের দিকে দৃষ্টি দেয়া।

৬। করব জিয়ারত করা এবং তাদের অবস্থা সর্ম্পকে চিন্তা করা, আর একথা মনে করা যে, তারা আজ আত্মসমালোচান করতে পারছে না বা জীবনে যে ভুল করেছে তা সংশোধন করতে পারছে না।

৭। ইসলামী জ্ঞান চর্চার বৈঠকাদিতে ও ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ করা।

৮। রাত্রি জাগরণ করে তাহজ্জুদ নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক অন্যান্য আমল করা।

৯। খেল-তামাশার স্থান থেকে দূরে থাকা, যা মানুষকে আত্মসমালোচনা করতে ভুলিয়ে দেয় এবং পরকাল বিমুখ করে তোলে।

১০। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দু'আ করা, যেন আল্লাহ তাকে প্রতিটি কল্যাণকর কাজের তৌফিক দান করেন।

১১। নিজের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা না করা। কেননা নিজের ব্যাপারে উচ্চধারণা করলে মানুষ আত্মসমালোচনা করতে ভুলে যায়। তার চোখে তখন অন্যের দোস-ত্রুটি ধরা পড়ে নিজের দোষ ধরা পড়ে না।

প্রিয় ভাই!

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মুমিনের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো, সে যেন আত্মসমালোচনা করতে এবং নফসকে চাপের ভিতর রাখতে শৈথিল্য না করে। কেননা জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস হলো মনি-মুক্তার মত মূল্যবান যার দ্বারা এমন গুপ্তধন বা খনি ক্রয় করা সম্ভব যা কোনদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে না। সুতরাং এসব শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়কে বিনষ্ট না করা বা এমন কাজে ব্যয় না করা

যাতে অকল্যাণ রয়েছে। যে এ কাজ করবে সে প্রকৃত পক্ষে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা একমাত্র নির্বোধ ব্যক্তিই করতে পারে। কিয়ামতের দিনই সে তার প্রকৃত ক্ষতি চাক্ষুস দেখতে পাবে।

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اَمَدًا بَعِيْدًا»۔ (آل عمران : ٣٠)

"যে দিন প্রত্যেকেই যা কল্যাণকর কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সে কামণা করবে যদি এর মাঝে ও তার মাঝে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি করা হতো। (আলে ইমরান ঃ ৩০)

সম্মানিত ভাই!

তাওবা ইবনে সিম্মাহ ছিলেন একজন আত্মসমালোচক। তিনি একদিন হিসাব কষে দেখলেন যে, তার বয়স ষাট বছর পার হয়ে গেছে, যার দিনের সংখ্যা হলো এগার হাজার পাঁচশত দিন। তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, হায় আমি আমার প্রভূর সাথে এগার হাজার গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করব? এটা কিভাবে সম্ভব প্রতিদিনতো হাজর হাজার গুনাহ করছি! এরপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। দেখা গেল তিনি এ দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন। লোকজন শুনতে পেল কে যেন বলছে, (তুমি উঠ! জান্নাতুল ফেরদাউসের পানে ছুটে যাও!)

আত্মসমালোচনা করার পদ্ধতি ঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, আত্মসমালোচনা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে করতে হবে ঃ

ফরজ আমল দিয়ে শুরু করতে হবে। যদি এতে কোন ঘাটতি থাকে তাহলে তা পূরা করতে হবে।

অতঃপর দেখতে হবে যে, সে হারাম কিছু করছে কি না। যদি কিছু করে থাকে তাহলে এর জন্য তাওবা করতে হবে, ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং নেক আমল করতে হবে।

এরপর দেখতে হবে যে, নিজের মাঝে শৈথিল্য রয়েছে কিনা? থাকলে তা দূর করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণ এবং দু'আ দুরুদ পাঠ করতে হবে।

এরপর আত্মসমালোচনা করতে হবে অঙ্গ-পতঙ্গের আচরণের ব্যাপারে। জিহ্বা কি ধরনের কথা বলে, পা কোন পথে চলে, হাত দ্বারা কি করা হয়, দৃষ্টি কোন জিনিসের উপর ফেলা হয়, কান দিয়ে কি শোনা হয়। এসব দ্বারা কি ভাল কিছু করা হয় নাকি মন্দ কিছু?

আত্মসমালোচনার উপকারিতা ঃ

আত্মসমালোচনার অনেক উপকারিতা বা ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঃ

০ নফসের দোষ-ত্রুটি জানা যায়। যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি জানতে পারে সে তা সংশোধনের অবশ্যই চেষ্টা করবে।

০ তাওবা করার সুযোগ ঘটবে এবং পূর্বে যা ছুটে গেছে তা পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

০ আত্মসমালোচনা করলে আল্লাহর হকের বিষয়টি অর্থ্যাৎ তাঁর ইবাদত কতটুকু করা হচ্ছে তা চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

০ আত্মসমালোচনা করলে বান্দা অবশ্যই আল্লাহর দরবাবে বিনয়ী ও অনুগত থাকবে।

০ আল্লাহর মহত্ব ও দয়ার কথা জানতে ও বুঝতে পারবে আর এটাও বুঝতে পারবে যে, মানুষ পাপ করলেও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দ্রুত পাকড়াও করেন না।

০ মন থেকে রিয়া, অহংকার দূর করতে আত্মসমালোচনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

০ আত্মসমালোচনার ফলে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে গতি আসবে এবং গুনাহ ত্যাগ করা সহজ হবে।

০ হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য পাওনা ফেরত দানে আত্মসমালোচনা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

জীবন চাকা

হে আমার মুসলিম ভাই! হযরত ফুজাইল এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার বয়স কত? তিনি বলেন, ষাট বছর। তখন তিনি তাকে বলেন, আপনি ষাট বছর ধরে আল্লাহর পানে চলেছেন, আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি তাঁর নিকট পৌছে যাবেন!!

হযরত আবু দারদা বলেন ঃ তোমার জীবনতো কয়েক দিনের সমষ্টি মাত্র। তোমার যে কয়দিন গত হয়ে যাচ্ছে জীবনের সে কয়দিন খসে যাচ্ছে। সুতরাং হে বিশ বছর বয়সী! তোমার কত সংগী মারা গেছে আর তুমি বেঁচে আছ!

হে তিরিশ বছর বয়সী! তুমি আজকে যুবক। তুমি কি তোমার আগের দিন গুলোর ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছো?

হে পঞ্চাশ বছর বয়সী! তুমি তো অর্ধশত বছর পেয়েছ। অথচ এখনও চিন্তা করে দেখছো না!

হে ষাট বছর বয়সী! তোমার পা তো কবরের দিকে উঠে গেছে। এরপরও ভোগ বিলাস নিয়ে মত্ত। প্রকৃতপক্ষে তুমিতো তোমার জীবনকে অপচয় করেছো।

সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার কোন আপত্তি গ্রহণ করবেন না, যাকে তিনি ষাট বছর বয়স দিয়েছেন।

হে প্রিয় ভাই! আপনি কত নাামায নষ্ট করেছেন? কত জুমা অবহেলায় ছেড়েছেন ? কত রোযা নষ্ট করেছেন ? কত যাকাত কৃপণতা করে আদায় করেননি ? ... কত হজ্জের সুযোগ নষ্ট করেছেন ? কত ভাল কাজের শৈথিল্য করেছেন? আর কত খারাপ কাজে সংঘটিত হতে দেখেও প্রতিবাদ না করে চুপ করে থেকেছেন? কত অশ্লীল কথা বলেছেন? পিতামাতাকে কত দুঃখ দিয়েছেন, তাদের সেবা করেননি ? কত দুর্বলের প্রতি কঠোর

হয়েছেন, তাদের প্রতি দয়া করেন নি ? কত মানুষের প্রতি জুলুম করেছেন ? কত মানুষকে গালি দিয়েছেন? কত মানুষের গীবত গেয়েছেন? কত মানুষের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করেছেন ?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমরা কি জান প্রকৃত দরিদ্র কে? তারা বললেন, আমাদের মাঝে সেইতো গরীব যার টাকা পয়সা বা ধন সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই প্রকৃত দরিদ্র যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে ওকে গালি দিয়েছে, এর সম্পদ গ্রাস করেছে, ওর রক্ত প্রবাহিতত করেছে, আরেক জনকে মেরেছে। অতঃপর তার নেকী থেকে একে দেয়া হবে, ওকে দেয়া হবে। যদি পাওনা পরিশোধের পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে ওদের গুনাহ্ নিয়ে এর ঘাড়ে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম)

আমরা জীবনের চাকা গড়িয়ে কত হাসছি, কত আনন্দ করছি, কিন্ত চিন্তা করছিনা যে, প্রত্যেকটা দিন পার করে মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি। সুতরাং আপনি মৃত্যুর পূর্বেই আমলের সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। কেননা, প্রকৃত লাভ ও ক্ষতি আমলের মাঝেই নিহিত।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনরা !

আপনাদের উপর আল্লাহর করুণা ও বরকত বর্ষিত হোক। আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্য পোষাক আশাক, বাড়ীঘর, গাড়ী ইত্যাদিতে কত সময় ব্যয় করি, আমাদের শারীরিক চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ করি শুধুমাত্র সুস্থ ও নিরাপদ থাকার জন্য। আমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছি যে, সতর্কতা স্বরূপ আমরা কত ঔষধ গ্রহণ করে থাকি যেন কোন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হই।

এরপর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি

আমাদের অন্তকরণ (ক্বল্ব) অনেক রোগ-বালাই এ আক্রান্ত হয় যা শারীরিক রোগের চেয়েও মারাত্মক ও বিপজ্জনক তা কি আমরা জানি? তা এ রোগ ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শেষ করে দেয় অথচ সে বুঝতে পারেনা। এ অবস্থায় ক্বলব পরিবর্তিত হয়ে কাল ক্বলব-এ রূপান্তরিত হয়। সে অবস্থায় তখন ক্বলব ভাল কাজকে ভাল বলে জানতে পারে না এবং মন্দকে ঘৃণা করে না-আমরা আল্লাহর নিকট এ অবস্থা থেকে পানাহ্ চাই। আমরা যখন এটি বুঝতে পারলাম তাহলে কি এ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়?

এ উদ্দেশ্যেই আমি এ লেখা আপনাদের জন্য পেশ করলাম। আমি এর দ্বারা প্রথমেই নিজেকে উপদেশ দিতে চাই এবং অন্যান্যদের যাদের আমি কল্যাণ চাই। আল্লাহ্‌র নিকট এ দু'আ করি যেন তিনি আমাদের ক্বলব-এর আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করেন, পরিশুদ্ধ করেন আমাদের অন্তঃকরণকে– আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!!

অন্তরের ব্যাধির কথা কেন ?

অন্তরের ব্যাধি সংক্রান্ত কথার গুরুত্ব কয়েকটি কারণে। সেগুলি হল-

১। আল্লাহ তা'য়ালা অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পরিছন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তিনি একে রিসালাতে মুহাম্মদীর বিশেষ উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঃ তাযকিয়ায়ে নফস-কে তিনি কিতাব শিক্ষা ও হিকমতের পূর্বে উল্লেখ করেছেন এর গুরুত্বের কারণেই।

«هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ». (الجمعة : ٢)

তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেকে পবিত্র (তাযকিয়া) করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। (জুমুআ ঃ২)

২। বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে অন্তরের ব্যাধির ব্যাপক প্রসারের ফলে (আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেছেন সে ব্যতীত) হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা,

কুধারনা, অহংকার, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং এ থেকে উদ্ভূত ঝগড়া বিবাদ, একে অপরকে বয়কট করা, সম্পর্কচ্ছেদ, দুনিয়ার প্রতি মোহ, কামনা-বাসনার পিছে ছুটে চলা এবং দুনিয়াই আজ অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে গেছে।

৩। অন্তরের ব্যাধির প্রভাব মানুষের জীবনে পড়ার কারণে তাদের নিকট নামায খুব কঠিন ও ভারী হয়ে গেছে। নামাযে দাঁড়ালে একাগ্রতা আসে না, আল্লাহকে ভয় করতে অনীহা করার পর্যায়ে এসে গেছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে চোখে পানি আসে না এবং কুরআনকে ত্যাগ করেছে। কুরআন পাঠ করলেও মন নরম হয় না, শরীর শিহরিত হয়ে উঠে না, ভাল আমল করলে খুশী লাগে না কিংবা খারাপ আমল করলে দুঃখ আসে না।

৪। মানুষের মাঝে তার অন্তঃকরণ (ক্বলব)টিই হল মূল চালিকা শক্তি, পরিকল্পনাকারী। অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ হল বাস্তবায়ন কারী। যদি অন্তঃকরণ ব্যাধি ও পঙ্কিলতা হতে এবং সুবাহ থেকে পবিত্র থাকে, তাহলেই মানুষ তার প্রভুর প্রকৃত আনুগত্য করতে পারে, পারে সঠিক ইবাদত করতে এবং তার স্বভাব চরিত্র ভাল হয়, তার অবস্থা সঠিক হয়, সে নিজে সুখী হয়, অন্যরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন অন্তর হল রাজা আর অঙ্গ প্রতঙ্গ হল তার সৈন্য-সামন্ত। যদি অন্তর ভাল থাকে তার সৈন্যরাও ভাল থাকে। আর যদি অন্তর খারাপ থাকে তাহলে তার সৈন্য-সামন্তরাও খারাপ হয়ে পড়ে।

৫। আল্লাহর নিকট আমল কবুল হবার জন্য অধিক কষ্ট করা বা বেশী আমল হওয়া জরুরী নয়। জরুরী হল তা যেন খালিস অন্তঃকরণে হয় অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হয়। দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে না হয়। অন্তর যতই পবিত্র হবে, পরিশুদ্ধ হবে, খালিস হবে প্রভুর কাছে তার মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাবে । মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ - اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ » - (الشعراء : ٨٨-٨٩)

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু সে ব্যক্তি উপযুক্ত ও সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে।" (শুয়ারা : ৮৮-৮৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ إِلى صُوَرِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلكِنْ يَنْظُرُ إِلى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ" - (رواه مسلم)

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টি দিবেন না তোমাদের চেহারা ও শরীরের দিকে। কিন্তু তিনি দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর (ক্বলব) ও আমলের দিকে।" (মুসলিম)

সুস্থ অন্তরের আলামত

মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আপনার অন্তর সুস্থ আছে কিনা তা কি আপনি জানতে চান? যে

উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে কাজ করছে কি না তা কি জানতে চান? তাহলে আসুন আমরা দেখি সে রকম আলামত রয়েছে কিনা যা উল্লেখ করেছেন মন বিশেষজ্ঞ ও মহান চিকিৎসক আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ)। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এ সব নিদর্শনকে চিহ্নিত করেছেন যেন আমরা প্রত্যেকে নিজ অন্তরকে এ দ্বারা মেপে দেখতে পারি। যদি এ সব বিদ্যমান থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র হাজারও প্রশংসা। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করার পূর্বেই দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, রোগ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়লে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কোনটিই কাজে আসবে না।

অন্তর সুস্থতার আলামত সমূহ

১। মন সর্বদা পীড়া দিতে থাকবে যেন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসে তাওবা করে।

২। আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ হবে না এবং তাঁর ইবাদত করতে বিরক্ত হবে না।

৩। যদি তার নির্দিষ্ট কোন দু'আ বা আমল যা সে প্রত্যহ করে থাকে, ছুটে যায় তাহলে এজন্য মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করবে। তার টাকা পয়সা বা ধন সম্পদ ক্ষতির চেয়েও একে বেশী কষ্টদায়ক মনে করবে। আল্লাহ্ তায়ালা ইবনুল কাইয়্যেমকে ক্ষমা রহম করুন- এটাতো কার কথা যার দৈনিক নির্দিষ্ট কোন অজিফা বা কোন আমল রয়েছে- যার কোন নির্দিষ্ট কিছুই নেই আর ফরজ নামায ছুটে যাবার পরও অন্তরে ব্যথা বা কষ্ট অনুভব করেনা ?

৪। ইবাদত করলে খানা-পিনার মজার চেয়েও অন্তরে বেশী মজা ও প্রশান্তি অনুভব করবে। আমাদের কি এ রকম হয় যে ইবাদত করলে বা ইবাদত করে বের হলে এরূপ প্রশান্তি অনুভব করি ?

৫। যখন নামাযে প্রবেশ করবে তখন তার দুশ্চিন্তা, কষ্ট বা দুঃখ সব দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আজ অবস্থা এমন যে, নামাযে দাঁড়ালেই এসব এসে হাযির হয়। এদের কাছে নামাযের মজা কোথায় ? সে নামায কোথায় যে সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"أَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ يَا بِلاَلُ"۔

"হে বেলাল! আমাদেরকে নামাযের মাধ্যমে আরাম-শান্তি দাও।" তিনি আরো বলেন :

"جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلاَةِ"۔

"নামাযে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে।" অথচ মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এ রকম হয়েছে যে, তারা যেন বলছে, হে ইমাম! আমাদেরকে নামায থেকে মুক্তি দিন!!

৬। তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ ও তার স্বত্ত্বাকে পাওয়া। আর এটি এক উচ্চ মর্যাদার কাজ।

৭। সে তার সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে যেন কোন ভাবেই সময় নষ্ট না হয়, যেমন কৃপণ ব্যক্তি তার সম্পদ সম্পর্কে সচেতন থাকে।

৮। তার উদ্দেশ্য ও প্রবল প্রচেষ্টা থাকবে আমলকে বিশুদ্ধভাবে পালন করার।

অন্তরের ব্যাধি সমূহ

অনেক ব্যাধি রয়েছে যার দ্বারা অন্তর আক্রান্ত হতে পারে। আমরা এর কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব যেন সতর্ক হতে পারি এবং সে সবে আক্রান্ত না হই। যদি এসবে আক্রান্ত হয়ে যাই তাহলে যেন তার চিকিৎসা শুরু করতে পারি। এসবের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল :

এক ঃ মুনাফিকী

রোগগুলোর মাঝে এটি সবচেয়ে মারাত্মক এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেউ যেন এ কথা কল্পনা না করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ শেষ হবার সাথে সাথে মুনাফেকী শেষ হয়ে গেছে এবং এর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সলুল ও অন্যান্যরা মারা যাবার ফলে মুনাফেকীরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বরং বর্তমানে মুনাফেকীর বিপজ্জনকতা পূর্বের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। মুনাফেকী শুরু হয় কথা বা কর্মের মাধ্যমে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুবিখ্যাত হাদীসে এ বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন ঃ

"مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُتُمِنَ خَانَ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ

غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"۔ (متفق عليه)

অর্থাৎ- 'যার মাঝে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফেক। এর মধ্যে একটি স্বভাব যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার মাঝে মুনাফেকের স্বভাব বিদ্যমান যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদি কিছু আমানত দেয়া হয় তাহলে সে তা খিয়ানত করবে, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে, ভঙ্গ করবে এবং যখন ঝগড়া-বিবাদ করবে তখন অশ্লীল কথাবার্তা বলবে।' (বুখারী, মুসলিম)

যদি কোন মানুষ এতে নিমজ্জিত থাকে, তাওবা না করে এবং তার মন-বাসনা চরিতার্থ করতে লিপ্ত হয়, তাহলে এসব তাকে বিশ্বাসগত মুনাফেকীর দিকে ধাবিত করবে, আমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাই।

এজন্য সালফে সালেহীনরা নিজেদের জন্য মুনাফেকীকে সব চেয়ে বেশী ভয় করতেন। এ জন্যই হযরত উমর (রাঃ) যিনি আমলের, ইসলাম ও নবীর সাহচর্যের ক্ষেত্রে দিক থেকেও সব চেয়ে বিশ্বস্ত- তিনি হযরত হুজায়ফা (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুনাফেকদের মাঝে গণ্য বলে বিবেচিত করেছেন ? তিনি বলেন, না। আপনার পরে অন্য কাউকে পবিত্রতার সার্টিফিকেট দিতে পারব না।

দুই ঃ রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

এটিও এক মারাত্মক ব্যাধি। কারণ, এটি খুবই সূক্ষ্ম এবং আমল নষ্ট

করতে এর প্রতিক্রিয়া খুবই ব্যাপক। এ থেকে খুব কম লোকই মুক্ত। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ"۔

"আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি তার আমলে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখান করব।"

এর ব্যাহ্যিক রূপ হলঃ দেখবেন কেউ কেউ কোন লোক দেখলে খুব উত্তম ভাবে নামায পড়ে। আর কেউ না দেখলে নামাযে শৈথিল্য করে বা খুব তাড়াতাড়ি নামায পড়ে। দেখিয়ে দেখিয়ে দান খয়রাত করে যেন বলা হয় যে, ওমুক দান করেছে, অথবা নফল রোযা রাখে বা জ্ঞান অর্জন করে কিম্বা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বা এ ধরনের কাজ করে যার বাহ্যিক রূপ খুবই উত্তম কিন্তু ভিতরে রিয়া বা লৌকিকতায় ভরা।

তিন ঃ হিংসা–বিদ্বেষ

এ রোগ থেকে আমাদের মধ্যে কেউ কি মুক্ত থাকতে পেরেছে ? শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেন, হিংসা হচ্ছে মানসিক ব্যাধি। এটি খুবই শক্তিশালী। এ থেকে অল্প লোকই

নিরাপদ থাকতে পেরেছে। এ কারণেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন ঃ

«اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه»۔ (النساء :٥٤)

"তারা কি লোকদের হিংসা করে যা আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তাদের দান করেছেন ?" (নিসা ঃ ৫৪)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا"–

"তোমরা একে অপরের প্রতি ঘৃণা করো না, একে অপরকে হিংসা করো না।" অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কোন বান্দাকে যে অনুগ্রহ দিয়েছেন সম্পদের বা সন্তানের বা সুস্বাস্থের অথবা পদমর্যাদার বা নিয়ামতের এ সবের হিংসা করে। এতে সত্যিই বিপদ রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এ বলে ঃ

"اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ"۔

"তোমরা সাবধান থেক হিংসা থেকে। কেননা হিংসা নেকীকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন লাকড়িকে খেয়ে (জ্বালিয়ে) ফেলে।

চার ঃ অহংকার, আত্মম্ভরিতা বা অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঠাট্টা-মশকরা করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

«سَاَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ»۔ (الاعراف : ١٤٦)

"আমার আয়াত হতে ফিরিয়ে দেব তাদের, যারা জমিনের বুকে অন্যায়ভাবে অহংকার করে।" (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

«إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلاَّ كِبْرٌ مَّاهُمْ بَالِغِيْهِ»۔ (مؤمن : ٥٦)

'নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলিল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না।' (মুমিন ঃ ৫৬)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

«يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْقَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسىٰ

اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ»۔ (الحجرات : ١١)

'হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।" (হুজুরাত ঃ ১১)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ"-

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" আজকের যুগে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ অনেক টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ দিয়েছেন অথবা উচু পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হচ্ছে।

পাঁচ ঃ কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসা

এটি খুবই মারাত্মক ব্যাধি। অন্তরের জন্য এ ব্যাধি বিষের ন্যায়। যখন কোন মানুষের ভালবাসা, বন্ধুত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য হয় বা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হয় এবং তার কামনা-বাসনা হয় দুনিয়ার জন্য তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

«اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ»۔ (الجاثية : ٢٣)

"আপনি কি দেখেননি ঐ ব্যক্তিকে, যে তার প্রবৃত্তিকে প্রভু বানিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও।" (জাসিয়া ঃ ২৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ"۔

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তিকে আমার আনিত বিধানের অধীনে আনবে।'

প্রিয় মুসলমান ভাই! এজন্য আপনি নিজেকে এ প্রশ্ন করুন? আমার সব সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, গ্রহণ ও দান, ভালবাসা ও বিরাগভাজন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে না অন্য কারো উদ্দেশ্যে? উত্তর খুজুন আপনার ব্যক্তিগত ও সাধারন জীবন যাপনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে।

ছয় ঃ অন্তর কঠিন হওয়া

এটি এক কঠিন ব্যাধি যা থেকে খুব কম লোকই নিরাপদ থাকতে পারে। এর অনেক কারণ রয়েছে– আল্লাহর নাম স্মরণ না করে অন্য কথায় বেশী মশগুল থাকা, হারাম মাল খাওয়া, গীবত-চুগলখুরী

করা, গান বাজনা শুনা, পর্ণ ছবি দেখা, অধিক হাসা, অধিক ভক্ষণ এবং অধিক ঘুম ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন :

«أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ»۔ (الحديد : ١٦)

"যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (হাদীদ ঃ ১৬)

এ ব্যাধির বিপজ্জনকতার জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এর কুপ্রভাবের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

«فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ»۔ (الزمر : ٢٢)

"যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ।" (যুমার ঃ ২২)

এ রোগের চিকিৎসা ঃ

আপনি নিশ্চয় এ ভূমিকার পর যাতে এর বিপজ্জনকতার ভয়াবহ্ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা পড়ার পর- মনে মনে ভাবছেন ঃ এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পথ কি? আল্লাহ্র ইচ্ছায় জবাব পেয়ে যাবেন নিম্নের কতিপয় বাক্যে যা এখন আপনার উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছে।

১. রোগের স্বীকার করা ঃ যদিও চিকিৎসা হবে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তবুও আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই চিকিৎসা করতে চাই। কারণ প্রথমে যদি রোগ সম্পর্কেই ধারণা না থাকে, নিজেকে যদি আক্রান্ত বলে স্বীকার না করে তাহলে সহজ পদ্ধতি পেয়েও চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসবে না। দুনিয়া ও আখিরাতে এ রোগের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে সে সম্পর্কে প্রথমেই ওয়াকিফহাল হতে হবে।

২. শরীয়াতের জ্ঞানার্জন করা ঃ কুরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী জ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের লেখা মানুষকে পথ দেখায় এবং দিক-নির্দেশনা দেয় এ রোগের চিকিৎসার।

৩. আত্মসমালোচনা করা, তাওবা এবং সতর্ক থাকা ঃ যে কোন মুসলমানই ছোট বা বড় সবধরনের বিপদ মুসিবতে বিচলিত হয়। কোন জ্ঞানবানই এর উপর অবিচল থাকতে পারে না। সে যে কোন পাপ করে ফেললেই তাওবা করতে এগিয়ে আসে। সে ব্যক্তিই দ্রুত তাওবা করতে পারে যে আত্মসমালোচনা করে, নিজের কথা কাজের পর্যালোচনা করে, পরখ করে দেখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

যা কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক হয় তার জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করে আর যা এ দু'য়ের বিপরীত হয় তার জন্য তাওবা করে। তাওবাই একজন মুসলমানের সঠিক পথে থাকার জন্য যথেষ্ঠ নয়। বরং সব সময় খেয়াল রাখতে হবে সতর্ক থাকতে হবে যেন আবার সে পাপ করে না বসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেন যেমনটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে– 'যদি তুমি কোন গুনাহ করে ফেল তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে এবং সে পাপ থেকে তাওবা করবে। কেননা কোন বান্দা যখন তার পাপকে স্বীকার করে এরপর তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।'

৪. আল্লাহর জন্যে নিষ্ঠা ও এখলাসের সাথে কাজ করা ঃ অন্তরের ব্যাধির জন্য মানুষের ব্যাহ্যিক প্রচেষ্টা ও শরিয়তের সকল পন্থাই যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে সাথে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যার হাতেই রয়েছে অন্তরের চাবিকাঠি তাঁর উদ্দেশ্যেই সবকিছু করতে হবে। বান্দার নিষ্ঠার উপরই আল্লাহর সাহায্য নির্ভর করছে অন্তরের ব্যাধি থেকে মুক্তি ও নাজাত পাবার বিষয়টি।

৫. সদাসর্বদা আল্লাহকে ভয় করা ঃ মনব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার উপকরণের মাঝে অন্যতম হল যে একজন মুসলমান সব সময় মহান আল্লাহ্র বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে, তিনি যেকোন মুহূর্তে তাকে পাকড়াও করতে পারেন।

তাকে যদি পাপের অবস্থায় ধরেন তাহলে হিসাব হবে খুবই কঠিন এবং শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর। অথবা একথা মনে করা যে, আল্লাহ তা'য়ালা এই দুনিয়াতে পাপের শাস্তি হিসেবে দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ শক্তি ও জ্ঞান ছিনিয়ে নিতে পারেন অথবা তার অন্তর ও অন্তর দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিতে পারেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ও লোকসান কিম্বা সন্তান-সন্ততিদের নষ্ট করে দিতে পারেন অথবা অন্য যে কোন শাস্তি দিতে পারেন, যেমন যারা তাঁকে ভয় করেনা তাদেরকে দুনিয়াবাসীর সামনে খুবই তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করে দিতে পারেন।

৬. বেশী বেশী নেক আমল করা ঃ চিকিৎসার জন্য কতিপয় ভাল কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একজন মুসলমানকে বেশী বেশী সৎকাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যেমন–

এক. জামায়াতের সাথে সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।

দুই. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

তিন. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা।

চার. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

পাঁচ . প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করা।

ছয়. নফল রোযা রাখা।

সাত. চাশত নামায আদায় করা।

আট. রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া।

নয়. বিতর নামায নিয়মিত পড়া।

দশ. দান-খয়রাত করা (বিশেষভাবে গোপন দান)।

এগার. রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষা করা এবং গরীব অসহায়ের

প্রতি দয়া করা। সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিকির করা। আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর যিকির এসব ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করে। এজন্য মুসলমানদের জন্য এ বিধান দেয়া হয়েছে, তার জিহবা যেন আল্লাহর যিকির বা স্মরণে সর্বদা ভিজা থাকে (ব্যতিক্রম ছাড়া)। যেমন :

৭. ক. বিভিন্ন প্রকারের দু'আ যথা বাড়িতে প্রবেশের দু'আ, বাড়ি হতে বের হবার দু'আ, খাবার দু'আ, ঘুমাবার দু'আ ইত্যাদি। খ. সকাল, সন্ধ্যার দু'আ। গ. সংখ্যা বাচক দু'আগুলি, যেমন আলহামদুলিল্লাহ দশ বার অথবা একশ বার পড়া, সুবহানাল্লাহ একশত বার পড়া, আল্লাহু আকবার একশত বার পড়া... ইত্যাদি। ঘ. সাধারণ যে কোন দু'আ।

৮. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা ঃ এটি একজন মুমিনের সব সময়ের জন্য একটি বিশেষ অস্ত্র। সব বিপদ আপদে আশ্রয়ের অবলম্বন। এজন্য একজন মুসলমানের কর্তব্য হল, সে সদা সর্বদা আল্লাহর নিকট তাঁর করুণা ও দয়া প্রার্থনা করবে, যাঞ্চা করবে তাঁর রহমত। চাইবে তাঁর নিকট নিরাপত্তা সব বিপদ মুসিবত হতে। তাকে যেন সুস্থ্ রাখেন রোগ-ব্যাধি থেকে। বিশেষ করে প্রার্থনা করবে সেই সময়টাতে যখন দু'আ কবুলের সময়- আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কবুল হয়।

৯. সর্বদা আখেরাতমুখী থাকা ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি না ঝুকা:

যখন কোন মুসলমান এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, এ দুনিয়া চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়। দুনিয়াবী হায়াত আজ বা কাল শেষ হয়ে যাবে,

যতবেশী বয়সই হোক না কেন শেষে মরতে হবে এবং কবরে যেতে হবে এবং পরকালে হয় জান্নাত বা জাহান্নাম হবে শেষ ঠিকানা তাহলে এটি তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার একটি কারণ হবে। বরং সে অন্তরের সব ব্যাধি ও কালিমা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্ মুখী হবে যেন পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে।

১০. কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা ঃ

শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি চায়না কোন মুসলমানের সামান্যতম কল্যাণ ও মঙ্গল যদিও ব্যাহ্যিকভাবে তারা এর বিপরীতটি দেখায়। যদি একথা কেউ নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, মানুষের অন্তরে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আল্লাহর বিরুদ্ধতা করার ক্ষেত্রে এ দুটি জিনিস বিরাট কারণ, তাহলে এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে, সৎ পথে চলা ও নেক আমল করার মাধ্যমে এবং সব ধরনের পাপ পঙ্কিলতা ও আল্লাহর অবাধ্যতা হতে দূরে থাকার মাধ্যমে। কেননা, প্রকৃত লাভ ও সফলতা রয়েছে এর মাঝেই যদিও তা পালন করতে বড় কষ্ট লাগে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার এবং সমস্ত সাহাবাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

কিভাবে তাওবা করব ?

প্রাথমিক কথা ঃ আমরা অনেকেই জানি না তাওবার গুরুত্ব ও এর প্রকৃত অবস্থা আর কিভাবে একে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। যদিও কেউ কেউ এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন কিন্তু এর সঠিক পন্থা অবগত নন। আবার কেউ কেউ এর পন্থা জানলেও জানেন না কিভাবে তা শুরু করতে হয়?

আমার প্রিয় ভাই! অতএব, আসুন আমরা তাওবার প্রকৃতি জানি ও এর পন্থা অবগত হই যেন তাওবার পথে ধাবিত হতে পারি।

আমরা সকলেই গুনাহগার

সুপ্রিয় ভাইয়েরা !

আমরা সকলেই পাপী-তাপী, গুনাহগার। একবার আল্লাহর পথে এগিয়ে যাই আবার এপথ থেকে পিছু হটি। একবার সব কাজে আল্লাহকে ভয় করি আবার আমাদের উপর গাফলতি এসে পড়ে। আমরা কেউ অপরাধ থেকে মুক্ত নই। আমাদের দ্বারা গুনাহ হয়েই যায়। আমি আপনি কেউই নিষ্পাপ নই।

"كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ"۔ (رواه الترمذى وصححه الألبانى)

"সমস্ত আদম সন্তানই ভুলকারী-গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার তারাই যারা তাওবা করে।' (তিরমিযী, আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে

সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন) ভুল-ক্রটি মানুষের স্বভাবজাত জিনিস। এই দুর্বল মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য তাওবার দরজা খুলেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন, বলেছেন এগিয়ে আসতে। যদি এটা না হত তাহলে অবশ্য মানুষ কঠিন সংকটে পড়ত। সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের হিম্মত হারিয়ে ফেলত এবং তার ক্ষমা ও মাগফিরাত লাভের আশা নিঃশেষ হয়ে যেত।

মুক্তির পথ কোথায় ?

আপনি হয়তো আমাকে বলবেন, আমি মানসিক শান্তি চাই, মুক্তির পথ জানতে চাই, ক্ষমা চাই, কিন্তু এর পথ সম্পর্কে অজ্ঞ, জানিনা কিভাবে শুরু করব? আমি হলাম ডুবন্ত ব্যক্তির মত, কেউ তার হাত ধরে টানুক। আমি পথহারা পথিকের মত পথ খুজছি, সাহায্যের অপেক্ষা করছি। আমি আশার আলো দেখতে চাই, চাই পথের দিশা, কিন্তু পথ কোথায়, কোন দিকে?

প্রিয় ভাই! পথ একেবারে স্পষ্ট সূর্যের মত, চাঁদের মত উজ্জল। এর পথ একটিই এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই... সেটি হচ্ছে তাওবার পথ... মুক্তির পথ খুবই সহজ পথ। সব সময় আপনার জন্য উন্মুক্ত। আপনাকে শুধু পা বাড়াতে হবে তাহলেই আপনি জবাব পাবেন ঃ

«وَإِنِّيْ غَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى». (طه : ٨٢)

“আমি ক্ষমাকারী যে তাওবা করে এবং ঈমান আনে আর সৎ কাজ

করে অতঃপর পথ অন্বেষণ করে।” (তা-হা ঃ ৮২) বরং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সমস্ত বান্দাদের ডাক দিচ্ছেন তাওবার জন্য সে মুমিন হোক বা কাফের হোক। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসবে, তার গুনাহ্ যতই বেশী হোক না কেন এবং যতই বড় হোক না কেন যদিও তা সমূদ্রের ফেনারাশির মত হয়। মহান রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»۔ (الزمر : ٥٣)

‘বলুন, হে আমার বান্দারা যারা তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাকারী করুণাময়।’ (যুমার ঃ ৫৩)

কিন্তু ... তাওবা কি?

তাওবা হল আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন সে দিকে ফিরে আসা প্রকাশ্য ও গোপনী উভয় বিষয়েই। এটি ইসলামী শরীয়ত ও ঈমানের প্রকৃতিকে একত্রকারী বিশেষ্য। এটি হতাশা ও নিরাশা থেকে বাঁচার পথ। এটি দুনিয়া ও আখেরাতে সকল শান্তি ও সুখের ঝর্নাধারা। এটি জীবনের

উত্থান ও মুক্তির ঠিকানা। এটিই প্রথম, মধ্যম ও শেষ ..., এটি বান্দার শুরু এবং সমাপ্তি ... এ হল আল্লাহর ভয়ে পাপ ত্যাগ করা, পাপের মন্দ দিক বুঝা এবং তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া আর কোন পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করা, যা ঘটেছে তা মনে করে লজ্জিত, অনুতপ্ত হওয়ার নাম হল তাওবা এবং বাকী জীবনে পাপ হতে বিরত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করার নাম।

কেন তাওবা করব ?

প্রিয় ভাই! আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমি সিগারেট ছাড়ব ? এতে আমি তৃপ্তি পাই ... কেন আমি ছবি দেখা বন্ধ করব? এতে আমি আনন্দিত হই ... কেন আমি মেয়েদের দিকে তাকান ছেড়ে দেব? এতে আমার প্রশান্তি রয়েছে ... কেন আমি নামায ও রোযার মাঝে নিজেকে বেধে ফেলব ? আমিতো কোন বাধা-ধরা মানতে রাযী নই। ... কেন? ...কেন? মানুষের কি তাই করা উচিৎ নয় যা তাকে শান্তি দেবে সুখ দেবে আনন্দ দেবে ? ... যা আমাকে আনন্দ দেয় তার নাম আপনারা বলছেন গুনাহ ... তা থেকে কেন আমি তাওবা করব ?

প্রিয় ভাই আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আপনি অবশ্যই জেনে রাখবেন যে, আমি আপনার জন্য চাই শান্তি, চাই আপনার আরাম, আমি শুধু আপনার কল্যাণই কামনা করছি এবং ইহকালে ও পরকালে আপনার মুক্তি ও পরিত্রান কামনা করছি।

এখন ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি-

আপনি তাওবা করুন, কেননা তাওবা -

১। এতে আপনার মহান প্রভুর নির্দেশের আনুগত্য করা হবে। তিনিই আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

«يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا»۔ (التحريم : ٨)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠভাবে তাওবা কর।' (তাহরীম ঃ ৮) আল্লাহ্র নির্দেশকে পালন করতে হবে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

২। দুনিয়া ও আখেরাতে এ হবে আপনার জন্য সফলতার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»۔ (النور : ٣١)

"তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবা) কর হে মুমিনগণ, যেন তোমরা সফলকাম হও।" (নূর ঃ ৩১)

প্রকৃত পক্ষে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়না, মুক্তি পায়না, সফলকাম হয়না, প্রশান্তি পায়না তার রবের বন্দেগী না করলে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে এবং তাঁর নিকট তাওবা না করলে।

৩। তাওবা আপনার রবের ভালবাসা সৃষ্টি হবার কারণ। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ» - (البقرة : ٢٢٢)

'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী ও পূত-পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।' (বাকারা ঃ ২২২)

যদি কোন মানুষ এটা অনুভব করে যে, তার প্রভু তাকে ভালবাসে যখন সে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাওবা করে, তাহলে কি সে এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করবে না ? তার কি আর কিছু বাকী থাকে ?

৪। তাওবা আপনার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির হাতিয়ার । আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا - وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا »- (نوح : ١٠-١٢)

"অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।" "তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন" "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" (নুহ ঃ ১০-১২)

মানুষের জান্নাত লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে কি ?

৫। আকাশ হতে বরকত নাযিল, শক্তি-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধির জন্য তাওবা একটি মাধ্যম। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَيقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ»۔ (هود : ٥٢)

"হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর, তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ে না।" (হুদ ঃ ৫২)

৬। তাওবা আপনার গুনাহ্ ক্ষমা করে তা নেকী দ্বারা পরিবর্তীত করে দেয়ার কারণ। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا»۔ (الفرقان : ٧٠)

"কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (ফুরকান ঃ ৭০)

প্রিয় ভাই! আপনি কি এসব অনুগ্রহ লাভের পাত্র হবার জন্য তাওবা করবেন না? কেন আপনি কার্পণ্য করবেন যাতে আপনার মনের প্রশান্তি রয়েছে? কেন আপনি নিজের উপর জুলুম করছেন আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে পাপ করে এবং নিজেকে তার সন্তুষ্টি লাভ হতে বঞ্চিত করছেন! আপনার সেদিকে দ্রুত এগিয়ে আসা উচিৎ যার এ হচ্ছে মর্যাদা ও প্রতিফল।

মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করা

তাওবা কর কথা বন্ধ হবার পূর্বেই
এগিয়ে যাও তাওবা নিয়ে
তা হল গচ্ছিত সম্পদ
দানশীলে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য গনীমত।

কিভাবে তাওবা করব ?

প্রিয় ভাই ! আমার মনে হয় আপনি চান, আপনার আত্মা তার সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরতে চায়। তার সৃষ্টিকর্তার কাছে আশ্রয় নিতে আগ্রহী। সে নিশ্চিত হয়েছে যে, মনের কামনা বাসনা পূর্ণ করা এবং ভোগের পিছনে ছুটায় প্রকৃত প্রশান্তি নেই, হারাম কাজ করলে শান্তি পাওয়া যায় না ... কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও আপনি জানেন না কিভাবে তাওবা করবেন? জানেন না কোথা থেকে শুরু করবেন?

আমি আপনাকে বলছি ঃ আল্লাহ্ যখন তার কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তার জন্য এর সব উপকরণ সহজ করে দেন, এ ব্যাপারে

তাকে সাহায্য করেন। আমি আপনার জন্য কিছু জিনিসের উল্লেখ করছি যা আপনাকে তাওবা করতে সহায়তা করবে ঃ

১. সঠিক নিয়তে খালিস তাওবা করুন

যখন কোন বান্দা তার প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজের নিয়তকে সহীহ্ করে এবং তাওবা করতে চায় তখন আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। তাকে শক্তি সাহস যোগান এবং তাওবার পথে যত বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করেন। আর যে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ না হয়, শয়তান তার উপর চড়াও হয় এবং সব পাপাচার ও অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বলেন ঃ

«كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ ط اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ»۔ (يوسف : ٢٤)

"আমরা এভাবেই তার থেকে অকল্যাণ ও অশ্লীলতা অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছি। সে ছিল আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্গত।" (ইউসুফ ঃ ২৪)

২. নিজের হিসাব করুন

নিজের আত্মার হিসাব করলে অবশ্যই কল্যাণের পথে এগিয়ে আসতে পারবেন। এটা আপনাকে অকল্যাণ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে এবং যা কিছু ছুটে গেছে তা পুষিয়ে নিতে সহায়তা করবে। এটা এমন একটি অবস্থান যা একজন লোককে তার ভাল ও

মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম করে তুলে, তাওবা করতে সাহায্য করে এবং তাওবা করার পর তা সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে।

৩। নিজের নফসকে ভর্ৎসনা করুন, তাকে ভীত করুন ও উপদেশ দিন

তাকে বলুন, হে নাফস! মরার পুর্বেই তাওবা কর, কেননা মৃত্যু হঠাৎ চলে আসবে। ওকে স্মরণ করিয়ে দিন ওমুকের মুত্যুর সংবাদ তুমি কি জাননা যে, মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবে? কবর হবে তোমার ঘর? মাটি হবে তোমার বিছানা? পোকা-মাকড় হবে তোমার...? তুমি কি এ আশংকা কর না যে, মরণদূত তোমার পাশে এসে পড়বে এ অবস্থায় যখন তুমি গুনাহে লিপ্ত? সে সময়ে আফসোস করলে কি কোন কাজে আসবে? তুমি কাঁদলে বা চিন্তিত হলে কি তা কবুল হবে? তুমি আজ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট অথচ দুনিয়া তোমাকে এড়িয়ে যেতে চায় ......আপনি এভাবে আপনার আত্মাকে ভর্ৎসনা করতে থাকবেন এবং তাকে স্মরণ করাতে থাকবেন যেন আল্লাহকে ভয় করে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে–তাওবা করে।

৪। পাপের স্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন

আপনি যে সব জায়গায় পাপ করতেন সেসব স্থানকে ত্যাগ করতে হবে, সেখানে যাতায়াত বন্ধ করতে হবে, এটা আপনাকে তাওবা করতে সাহায্যে করবে। ঐ ব্যক্তির কথা স্মরণ করুন যে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছিল, তাকে একজন আলেম বলেছিলেন, "তোমার জাতি হচ্ছে খারাপ জাতি। ওমুক ওমুক স্থানে কিছু লোক

রয়েছে তারা আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমি সেখানে যাও এবং তাদের সাথে ইবাদত কর।"

৫। খারাপ সঙ্গী-সাথী ত্যাগ করুন

আপনার মন তাদের সাথে চলতে চাইবে। আর একথা ভালভাবে জেনে রাখুন যে, তারা আপনাকে কখনো ছাড়তে চাইবে না। কারণ তাদের পিছনে রয়েছে শয়তান, যে তাদেরকে সব সময় খারাপ ও গুনাহের কাজে লাগিয়ে রাখছে, গুনাহ্‌র দিকে ধাবিত করাচ্ছে। অতএব আপনি আপনার বাসার ঠিকানা পরিবর্তন করুন, টেলিফোন নাম্বার পাল্টান এবং যথাসম্ভব আপনার যাতায়াত ও চলাফিরার পথ পরিবর্তন করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই বলেছেন ঃ

"وَالْمَــــرْءُ عَلى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اِلى مَنْ يَخَالِلْهُ" ـ(رواه ابو داودوالترمذى وحسنه الألبانى)

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মেকর্মে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তোমাদেরকে দেখতে হবে কার সাথে তুমি বন্ধুত্ব করছ।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।)

৬। পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা চিন্তা করুন

বান্দা যখন জানবে যে, পাপ হচ্ছে খুব খারাপ জিনিস, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এই পাপ করার ফলে তার জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে, তাহলে প্রথমেই সে পাপ পরিহার করতে চাইবে। আর যদি কিছু পাপ করেই ফেলে তাহলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তাওবা করবে।

৭। আপনার মনকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখান

আপনার মনকে জান্নাতের কথা ও এর অসংখ্য, অফুরন্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিন এবং তাকে জাহান্নাম ও তার ভয়াবহ শাস্তির কথা জানিয়ে ভয় দেখান।

৮। মনকে সে সব কাজে লাগিয়ে দিন যা আপনার উপকারে আসবে এবং তাকে একাকী ও অবসর রাখবেন না

আপনার মনকে যদি সঠিক কাজে ব্যস্ত না রাখেন তাহলে সে বাজে বা বাতিল কাজে জড়িয়ে পড়বে। কর্মহীনতা ও অবসর খারাপ ও পঙ্কিলতার দিকে এবং অসৎ সঙ্গের দিকে নিয়ে যায়।

৯। আপনার কামনার বিপরীত কাজটি করুন

মানুষের কামনা-বাসনার মত বিপজ্জনক বিষয় আর কিছু নেই। এজন্য মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

«أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ».(الفرقان : ٤٣)

অর্থাৎ "আপনি তাকে কি দেখেননি, যে তার কামনা-বাসনাকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে?" (ফুরকান ঃ ৪৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায় তাকে পূর্বের সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং কামনা বাসনার পিছনে সে আর ছুটবে না।

১০। প্রিয় বন্ধু! আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা আপনাকে তাওবা করতে সহায়তা করবে

যেমন আল্লাহ্র নিকট দু'আ করা যেন তিনি আপনাকে তাওবা করার

সুযোগ দেন। আল্লাহর স্মরণ করা, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, পরকালের চিন্তা করা, লোভ-লালসা কমিয়ে আনা। কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে পড়া এবং এজন্য ধৈর্য ধরা। বিশেষ করে প্রথম দিকে। এ ধরনের আরো অন্যান্য সব কাজ করা যা আপনাকে তাওবা করতে সহায়তা হবে।

সত্যিকার তাওবার শর্তসমূহ

প্রিয় ভাই!

সত্যিকার তাওবা করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, এসব শর্ত পূরণ হলে আল্লাহর নিকট তাওবা গ্রহণীয় হবে। সেগুলি হল-

এক ঃ খালেস নিয়তে তাওবা করা

আপনার তাওবা যেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যেই হয়। তাঁর করুণার প্রতি আগ্রহ ও তাঁর শাস্তির ভয়ে হয়। এর উদ্দেশ্য যেন দুনিয়ার কোন স্বার্থ না হয়। এজন্য মহান প্রভু বলেন ঃ

«يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ

لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ»۔

(التحريم : ٨)

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওবা কর– আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (তাহ্‌রীম ঃ ৮)

দুই ঃ পাপ ও গুনাহ হতে মুক্ত হওয়া

পাপে নিমজ্জিত ও জড়িত থাকা অবস্থায় তাওবা কল্পনা করা যায় না। তাওবা করার পর যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে এর জন্য পুনরায় তাওবা করতে হবে তবে এতে পূর্বের তাওবা নষ্ট হয়ে যাবে না। কিন্তু অবশ্যই নতুন ভাবে তাওবা করতে হবে।

তিন ঃ পাপ স্বীকার করা

কেননা কেউ যদি নিজের অপরাধ বা পাপকে স্বীকার না করে তাহলে কি ভাবে তাওবা করবে? এমতাবস্থায় অকপটে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে।

চার ঃ পূর্বে সংঘঠিত পাপের জন্য অনুশোচনা করা

নিজের পাপের জন্য অনুশোচনা না করলে তাওবা হয় না। এজন্য কেউ যদি পূর্বের গুনাহের কথা বলে গর্ব করে তাহলে তাকে অনুতপ্ত বলা যাবে না। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রকৃত তাওবা হল অনুতপ্ত হওয়া।" (আহমদ, ইবনে মাজা)

পাঁচ ঃ ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প করা

কেউ যদি আবার পাপ করার নিয়্যত রেখে তাওবা করে তাহলে তা সঠিক হবে না। প্রকৃত তাওবা হবে সে ব্যক্তির যে মনে মনে সংকল্প করবে যে ভবিষ্যতে আর কখনো পাপ-অন্যায় করবে না।

ছয় ঃ প্রাপ্য পাওনা ফেরত দান

যদি অপরাধ সংঘঠিত হয় কোন মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাহলে ওয়াজিব হবে তার প্রাপ্যকে ফিরিয়ে দেওয়া, যদি কেউ সঠিক তাওবা করতে চায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأحَدٍ مِنْ عِرْضٍ أَوْشَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ الاَّ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَ عَلَيْهِ "۔(رواه البخارى)

অর্থৎ - "কোন ব্যক্তি যদি কারো নিকট কোন কিছুর পাওনা থাকে তাহলে যেন সে কিয়ামতের পূর্বেই তা পরিশোধ করে নেয়, কেননা সে দিন কোন টাকা পয়সা থাকবে না। তখন তার যদি কোন সৎকর্ম থাকে তাহলে তার জুলুম এর পরিমাণ নেকী কেটে নেয়া হবে। যদি নেকী না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী)

সাত ঃ তাওবা কবুল হবার সময়ের মাঝেই তাওবা করতে হবে

সেটি হল মৃত্যু আসার পূর্বেই এবং সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবার পূর্বেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ" - (أحمد والترمذى)

"নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করবেন যতক্ষণ না ঘড়ঘড়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যে দীর্ঘশ্বাস আসে। (আহমাদ তিরমিযী) এ দীর্ঘশ্বাসের পূর্বেই তাকে তাওবা করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেন ঃ

"اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" - (رواه مسلم)

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রাতে তাঁর হাত সম্প্রসারিত করেন দিনের

পাপীকে ক্ষমা করার জন্য এবং দিনের বেলায় তাঁর হস্ত সম্প্রসারিত করেন রাতের বেলার পাপকারীকে ক্ষমা করার জন্য, এ অবস্থা চলতে থাকবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবার পূর্ব পর্যন্ত।" (মুসলিম)

তাওবা কবুল হবার আলামত

সুপ্রিয় ভাই! খালেস তাওবার কতিপয় আলামত রয়েছে যা তাওবা কবুল ও সঠিক হওয়া বুঝায়। এসব আলামত হলঃ

১। তাওবা করার পর বান্দার অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে ভাল হবে। প্রত্যেকেই মনে মনে এটা অনুভব করবে। তাওবার পর বান্দা আল্লাহর পানে রজু হবে। তার মনের অবস্থা দৃঢ় ও মজবুত হবে যা তার তাওবা খাটি হওয়া এবং আল্লাহ্‌র নিকট মাকবুল হওয়া বুঝাবে।

২। গুনাহের দিকে আবার ফিরে যাবার আশংকা থাকবে। কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র পরীক্ষা হতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত তার মাঝে এ আশংকা বিদ্যমান থাকবে।

«اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ»- (حم السجدة : ٣٠)

"তোমরা ভয় করিও না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদের জন্য করা হয়েছিল।"

(হা-মীম সিজদা ঃ ৩০) সে সময় তার ভয় দূর হবে এবং আশংকা কেটে যাবে।

৩। তার দ্বারা যে পাপ সংঘটিত হয়েছে তাকে অন্তরে যেন বড় করে দেখে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "একজন মুমিন পাপকে এভাবে দেখে যে, সে যেন বড় এক পাহাড়ের নিচে বসে আছে এবং সে তার উপর চেপে পড়ার আশংকা করছে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার পাপকে দেখে যেন তার নাকের ডগা দিয়ে একটা মাছি উড়ে গেল। অতঃপর সে বলে আরে এটা তো ঐ রকম।" কিছু সালফে সালেহীন লোক বলেন, তুমি গুনাহের ছোট দিকটির প্রতি দেখ না বরং দেখ তুমি কার অবাধ্য হয়েছ সে দিকটি।

৪। তাওবা যেন বান্দার অন্তরে অনুশোচনা, নম্রতা ও দীনহীন ভাব সৃষ্টি করে- প্রভুর সামনে বিনয়ী হয়। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হল সে বান্দা, যে তার সামনে বিনয়ী, নম্র ও মাথা নত করে এসে উপস্থিত হয়। অন্তর সব সময় আল্লাহ্র স্মরণে তরতাজা থাকে, কোন অহংকার, আত্মম্ভরিতা না থাকে। অন্যদেরকে তাদের গুনাহের জন্য ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য না করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তাওবাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

৫। অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, জিহ্বার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। জিহ্বাকে হিফাজত করতে হবে মিথ্যা,

গীবত, চুগলখরী ও অনর্থক কথাবার্তা হতে। একে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হতে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তার কিতাব তেলাওয়তের মাঝে। পেট সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যেন হালাল জিনিস খাওয়া হয়, সতর্ক হতে হবে যেন হারামের প্রতি দৃষ্টি না দেয়। কান সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে যেন গান, মিথ্যা কথা বা গীবত না শুনে। হাতের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে যেন তা হারামের দিকে প্রসারিত না হয়। পা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে যেন তা দিয়ে অপরাধ বা গুনাহের জায়গায় না যায়। অন্তরের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যেন একে হিংসা বিদ্বেষ ও চক্রান্ত হতে পবিত্র রাখা যায়। আরও সতর্ক হতে হবে যেন অন্তঃকরণ একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয় এবং সুখ্যাতি পাওয়া ও অন্যকে দেখানোর ইচ্ছা (রিয়া) হতে মুক্ত থাকে।

শিথিলতা থেকে সতর্ক থাকুন

সুপ্রিয় ভাই! বান্দা জানে না তার মৃত্যুর সময় কখন? জানে না জীবনের আর কত বাকী। এটা খুবই দুঃখজনক যে, অনেকেই তাওবার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা বলেঃ এখন তাওবার সময় নয়। এখন জীবনটাকে উপভোগ করি। বয়স আরো বেশী হো'ক তখন তাওবা করব। এটা নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোকা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতারণা। শয়তান মানুষকে বহুদিন বেঁচে থাকার আশা জাগ্রত করে দেয় এবং চিরদিন দুনিয়ায় থাকবার ওয়াদা দেয়

অথচ সে এর ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসুন ... গাফলতী হতে সাবধান, শিথিলতা হতে সতর্ক হোন, খুব বেশী আশা করবেন না। বেশী আশা-আকাঙ্খাই মানুষকে গাফলতীতে ফেলে দেয়।

তাওবার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসুন। শৈথিল্য পরিহার করুন কেননা এটিও একটি পাপ যা থেকে তাওবা করা উচিৎ। সুতরাং তাওবা তাড়াতাড়ি করা ওয়াজিব। আপনার মৃত্যু আসার পূর্বেই, সব আশা শেষ হবার আগেই তাওবা করুন, শেষ মুহূর্তে আফসোস করলে কোনই ফায়দা হবে না। কেননা আপনি জানেন না কখন আপনার দিন শেষ হয়ে যাবে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে।

তাওবা করুন আপনার অন্তরে মরিচা পড়ার পূর্বেই, যেন এমন জং না ধরে যে, তা উঠানোই যাবে না। তাওবা করুন আপনার অসুখ বা মৃত্যু আসার পূর্বেই যখন আর তাওবা করার সুযোগই পাবেন না।

আল্লাহর নিয়ামত ও সহনশীলতায় আত্মভোলা হবেন না, প্রিয় ভাই! অনেকেই নিজের উপর অবিচার করে গুনাহ্ ও অপরাধ করে। তাকে উপদেশ দিলে বা পরিণাম পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করলে বলে, আরে কত লোককে দেখছি রাতদিন পাপ করছে, তাদের অপরাধে দুনিয়া ভরে গেছে তবুও তারা কত সুখে আছে- আরামে খাচ্ছে। এরা

ভুলে যায় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে ভালবাসেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও এ দুনিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে এটা তাদের জন্য সামান্য অবকাশ বা ঢিল, কিন্তু যখন তিনি টান দিবেন, পাকড়াও করবেন তখন আর পরিত্রাণ নাই। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ যখন দেখবে আল্লাহ্ তার বান্দাকে গুনাহ্ করা সত্ত্বেও দুনিয়া দিচ্ছেন তখন বুঝবে এটা অবকাশ। এরপর তিনি আল্লাহ্র এ বাণী পাঠ করেন ঃ

«فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ـ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

(الانعام : ٤٤-٤٥)

'যখন তারা তাদেরকে দেয়া উপদেশ ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সব দরজাই উন্মুক্ত করে দেই। যখন তারা এসব পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে আমরা তখন তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। যারা অত্যাচারী তাদের শিকড় কেটে দেই এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।' (আনআম ঃ ৪৪-৪৫)

সুপ্রিয় ভাই!

আল্লাহর পানে তাওবার জন্য ছুটে আসুন। মনের কামনা-বাসনা হতে পলায়ন করুন, গুনাহ্ থেকে পালান... অপরাধ হতে দৌড় দিন কুপ্রবৃত্তি হতে ছুটুন... পুরাপুরি দুনিয়া থেকে পলায়ন করুন। আল্লাহর পানে তাওবা করে ফিরে আসুন... তার দরবারে তাওবা নিয়ে হাজির হোন, আপনার গুনাহ্ যতই যতই বড় হোক না কেন বা যতই বেশী হোক না কেন। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা তার হস্ত প্রসারিত করেন রাতের বেলায় যেন দিনের বেলার পাপীদের ক্ষমা করেন এবং দিনের বেলায় হাত বাড়ান যেন ক্ষমা করেন রাতের বেলায় পাপকারীদের। সুতরাং আসুন প্রিয় ভাই আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের পানে সময় শেষ হয়ে যাবার আগেই।

আল্লাহর নিকট দোয়া করি যেন তিনি আমাকে এবং আপনাকে সঠিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার দিকে সঠিকভাবে অনুগত হয়ে আসার তাওফীক দান করেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর, তার পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

নামায আদায়ের জন্য চিঠি

একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঃ বর্ণনাকারী বলেন,

আমি আমার এক প্রতিবেশীকে চিনতাম। আল্লাহ্ তাকে যে সুস্বাস্থ্য, কর্মচঞ্চলতা ও টাকা-পয়সা দিয়েছেন তা নিয়ে তিনি বেশ গর্বিত ছিলেন। তাকে প্রায়ই দেখতাম বন্ধুদের নিয়ে গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার বন্ধুদের দেখে মনে হত এরা আল্লাহ্র দ্বীনের কাছেও নেই। যখনই দেখা হতো তখনই তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সৎ উপদেশ দিতাম, বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে, জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের জন্য তাকে বলতাম। কিন্তু তিনি আমার সম্মানার্থে চুপ করে থাকতেন, কোন জবাব দিতেন না। কখনো বা মুচকি হাসতেন। তার এই অনাগ্রহে আমি বেশ হতাশ হয়েছিলাম। .. বেশ কিছুদিন পর আমার আরেক প্রতিবেশী বললেন আমাদের উল্লেখিত প্রতিবেশী এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অবস্থার অবনতির কারণে তাকে ইনসেনটিভ কেয়ার–এ রাখা হয়েছে। আশংকাজনক অবস্থা কেটে যাবার পর হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। তিনি পুরাপুরি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত, নিজে নড়াচড়া বা চলাফেরা করতে পারছেন না। প্রাকৃতিক কাজকর্মেও অন্যের সহযোগিতা নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া অপারেশন ও শারীরিক যন্ত্রনাতো রয়েছেই যা

একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাই ভাল জানেন।

আমি তাকে সালাম দিলাম ও তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্র হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, তার চোখ দুটি পানিতে ভিজে গেল, অবস্থার এতটা অবনতি হয়েছে যে তার- শরীর অবশ হয়ে গেছে। তখন তার স্মরণে আসল কিভাবে সে জীবন যাপন করতো, কত নিয়ামতে ছিল, হাসি-খুশি ছিল, সুস্থ্ ছিল, আমার সৎ উপদেশের কথা তার মনে পড়ল। তার এটাও মনে পড়ল আমি তাকে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলতে পরামর্শ দিয়েছিলাম ...। আমি তাকে ধৈর্য ধরতে বললাম এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করলাম, তাকে আশার বাণী শুনালাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এখন কি করতে মন চাচ্ছে বা বিশেষ কি ইচ্ছা পোষণ করছেন? তিনি বললেন, আমার একটি মাত্র ইচ্ছা রয়েছে, যদি আমি আমার এ দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারি তাহলে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে হাজির হব! এ কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। ... এরপর ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসলাম। আমি তার চেয়েও বেশী চিন্তিত, দুঃখীত ও মর্মাহত ছিলাম। মনে মনে বললাম, গতকালের এই দাম্ভিক লোকটির অহংকার এখন কোথায়? কোথায় তার আত্মম্ভরিতা? কোথায় তার আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিমুখতা এবং নামায আদায়ে অনীহা? চোখের পলকে তা সব চলে গেছে!!

যদিও আমি এমনটি চাইনি, কিন্তু এই দুর্ঘটনা তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে। এটি তার পাপ হতে তাওবা করার একটি কারণ হল। তিনি

আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে ফিরে আসলেন। এটি তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট করুণা যা আল্লাহ্‌ তাকে বিপদের মাধ্যমে দিয়েছেন। ... আমি আল্লাহ্‌র নিকট কায়মন বাক্যে দু'আ করি তিনি যেন তাকে মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক পথের উপর দৃঢ় ও মজবুত রাখেন। (আমীন)

সুপ্রিয় ভাই! আপনার নিকট আমার এ ভ্রাতৃত্বের চিঠি লিখবার প্রারম্ভে একটি বাস্তব সত্য ঘটনা উল্লেখ করলাম। যে সত্য ঘটনা দেখে আমি সত্যিই খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম যা আমাকে ব্যথিত করেছিলো। আমি আপনার নিকট এ চিঠি দিচ্ছি আমার মনের কথা আপনাকে জানানোর জন্য, আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির কারণে। তা না হলে কি এত কষ্ট করে আপনার নিকট চিঠি লিখতাম। আপনার কাছে লিখা আমার এ খোলা চিঠি কি আপনার চোখে পড়বে, মন কি চাইবে পড়তে, চিন্তা-চেতনায় এ লেখা কি রেখাপাত করবে, আশা করি মন দিয়ে পড়বেন। আপনি হয়ত মনে মনে বলবেন আমি কি উদ্দেশ্যেই বা আপনাকে চিঠি লিখছি। আমি কে যে আপনাকে চিঠি লিখছি? তাই আমি আপনাকে বলছি– এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনুক বা না চিনুক। প্রকৃত ভাই হল সে, যে তার ভা'য়ের মাঝে কোন ভালকিছু দেখলে তা প্রকাশ করবে আর কোন কিছুর কমতি দেখলে বা দুর্বলতা দেখলে তাও বলে দেবে। আর এ কথা বিশ্বজনীন সত্য যে, কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত নয়।

প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। কিন্তু উত্তম গুনাহগার হল 'তাওবাকারী'। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আমি আপনার মাঝে যে দুর্বলতা লক্ষ্য করছি তা হল- মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে যদিও আপনার অনেক মহৎ গুণাবলী রয়েছে কিন্তু এটি একটি দুর্বলতা ও কমতি যা মোটেই ছোট ও তাচ্ছিল্য করার মত নয়...। আমাদের চির শত্রু শয়তান আমাদের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ায় এ কথা বলে যে, 'এগুলি হল ব্যক্তিগত বিষয় এতে কারো নাক গলাবার অবকাশ নেই'। এজন্যই এটি মারত্মক বিভ্রান্তিকর কথা। আমি একান্ত চুপি চুপি আপনাকে এ চিঠি লিখছি। আপনি ও আমি ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। আমি আশা করি আপনি সহজভাবেই তা গ্রহণ করবেন– আপনার এক ভায়ের পক্ষ থেকে, যে আপনাকে ভালবাসে, আপনার মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে।

প্রিয় ভাই!

যখন আমরা দেখি যে, কতিপয় মুসলমান ভাই পুরাপুরি বা আংশিকভাবে জমায়াতের সাথে সালাত (নামায) আদায় করছে না, তখন আমাদের মন দুমড়ে মুচড়ে যায়, দুঃখ ও যাতনায় অন্তর পুড়ে যায়। তখন প্রশ্ন জাগে-

জামায়াত পরিত্যাগের কারণ কি?

-খুব বেশী আশা-ভরসা ঃ

কিছুলোক শয়তানের প্ররোচনায় এটা মনে করে যে, সে কমপক্ষে

সত্তর আশি বছরের আগে মরবে না, তাই এ জীবনকে যতদিন পারা যায় উপভোগ করে নিতে হবে, দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মনে হয় যেন সে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, শেষ বয়সে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে তার এই গাফলতীর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। সে একথা ভুলেই গেছে যে, যে কোন মুহুর্তে মৃত্যু হতে পারে, তখন আফসোস করবে হা-হুতাশ করবে যা কোন কাজে আসবে না।

-নাকি নামাযের অপরিহার্যতা সর্ম্পকে অজ্ঞতা ঃ

নামায হল ইসলামের খুঁটি। যে নামাযকে নষ্ট করল, সে ইসলামের আর সব বিধানকে সহজেই নষ্ট করে ফেলবে। মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। শরয়ী কোন ওজর ব্যতিরেকে যেমন– সফর বা অসুস্থতার অবস্থা ছাড়া জামায়াতে নামায ত্যাগ করা যাবে না।

-নাকি গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে ঃ

বেশী বেশী গুনাহের কারণে অন্তঃকরণ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। ওয়াজিব ও আনুগত্যের কাজ করতে চায় না, এমন কি কোন গুনাহের কাজ করলেও মনে ব্যাথা বা কষ্ট সৃষ্টি হয়না অথচ গুনাহের কাজে টাকা পয়সা নষ্ট হয়। সবই করা হয় কিন্তু হয়না জামায়াতে নামায পড়া।

-নাকি শয়তান আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল ঃ

আমাদের অনেকেই শয়তানের নিকট ফুটবলের মত হয়ে গেছে। যেমন ইচ্ছা সে আমাদের নিয়ে খেলা করছে। যদি আমাদের হারাম

কাজ করার নির্দেশ দেয় তাহলে আমরা সে হুকুম পর্যন্ত পালন করে ফেলি। এমন বিষয়ে নিষেধ করে যা করা ওয়াজিব, আর শয়তানের কথা শুনে আমরা তা করি না। ব্যক্তির মাঝে এমন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়নি যে সে বলবে যে বলে- না, হাজারো না, তুমিতো আমার প্রকাশ্য শত্রু, তুমি চাও যেন আমি তোমার দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হই!!

-নাকি কারণ হল রাত জাগা ও সময়ানুবর্তিতার অভাব ঃ

অনেকের কাছে এমন সব প্রোগ্রাম রয়েছে যে রাত হয়ে গেছে তাদের নিকট দিনের মত, আর দিন হয়েছে রাতের মত। নামাযকে পিছনের সারিতে ফেলে আনন্দ উপভোগের প্রোগ্রামকে সামনে এনেছে, অগ্রাধিকার দিয়েছে খানা-পিনা ও ভোজের সব অনুষ্ঠানগুলিকে !

-নাকি অহংকারের কারণে ঃ

তাদের আচরণ দেখলে মনে হয় যেন তাদের আর কোন রবের প্রয়োজন নেই। সে তার রবের সাহায্য সহায়তার মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছে সেটিরও মুখাপেক্ষী সে নয়। যেমন সুস্বাস্থ্য, যৌবন, শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ামত ইত্যাদি। সে একথা ভুলেই গেছে যে, এসব নিয়ামতের মূল চাবিকাঠি আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি মুহুর্তে এসব ছিনিয়ে নিতে পারেন। যেমনটি আমরা বর্ণিত ঘটনায় দেখেছি। এ ধরনের অনেক ঘটনা এ অবস্থার বাস্তব সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন– যারা হাসপাতালের বেডে বা বাড়ির বিছানায় বছরের পর বছর ধরে পড়ে রয়েছে। এটা আল্লাহ

এজন্যই করেছেন যেন মানুষ তার দুর্বলতা ও অপারগতা বুঝতে পারে। আর একথাও বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহ্‌র রহমত, দয়া ও সাহায্য ছাড়া কারো কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

-নাকি অন্য কোন কারণ রয়েছে যা আমরা জানি না ঃ

প্রিয় ভাই! এবার আপনি অন্য আর একভাবে চিন্তা করুন। যেমন যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে কোন অনুষ্ঠানে বা কোন এক হোটেলের প্রোগ্রামে দাওয়াত দেয় ? তাহলে আপনি সেখানে যাওয়ার জন্য কেমন প্রস্তুতি নিবেন? আপনি কি ঘুম বা অন্যান্য কাজকর্মের অজুহাত দেখিয়ে এই দাওয়াত কবুলে অপারগতা প্রকাশ করবেন? নাকি আপনি এর জন্য সকাল সকাল প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন এবং সবকিছু বাদ দিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরী হবেন যেন কোনভাবেই এ অনুষ্ঠানে আপনার অনুপস্থিতি না ঘটে। আপনি যদি শুনেন যে, এক ব্যবসায়ী ঘোষণা করেছে যে, খুব ভোর ৪টার সময় যে কেউ তার নিকট হাজির হয়, তাকে তিনি এক লক্ষ টাকা বা এর চেয়ে বেশী কিছু দান করবেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কল্পনা করা যায় যে, অনেকের সাথে আপনিও সেখানে যেয়ে হাযির হবেন ? এই সুবর্ণ সুযোগ কি কেউ হাত ছাড়া করবে? বরং কেউ কেউ পরিবারের সকলকে নিয়ে হাযির হবে এত বিরাট অংকের টাকা পাবার জন্য? অবস্থা যদি এ রকমই হয়, তাহলে এটা কি উচিৎ হবে যে, বান্দার ডাককে আল্লাহ্‌র ডাকের থেকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে? অথচ আল্লাহ্ হলেন আপনার সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, যার হাতে আপনার

কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত। আপনি সেই ব্যবসায়ীর দিকে ছুটে যাবেন টাকা পয়সার জন্য পরিবেশ যতই খারাপ হোক না কেন? অথচ আপনি সাড়া দিচ্ছেন না আল্লাহ্‌র ডাকে। যিনি অসংখ্য নেকী ও মর্যাদা রেখেছেন মসজিদে নামাযের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে ফজরের নামাযে।

প্রিয় ভাই! একজন মুসলমানের নামায আদায়ে শৈথিল্য তাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ে যায় এর চেয়েও বেশী মারাত্মক ও বিপজ্জনক দিকে, যদি সে নির্দিষ্ট সময় হতে দেরীতে নামায আদায় করে। আপনি দেখবেন অনেকেই সময় পার হবার পর নামায আদায় করছে। ফজর নামায পড়ছে কাজে বের হবার সময় বা ক্লাসে যাবার সময়! আসর পড়ছে সূর্য ডুবার পর! মনে হয় যেন দ্বীনের কাজ তার মর্জি ও মেজাজের ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছে। সে ভুলেই গেছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নামাযের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন না। যেমন কেউ সময়ের পূর্বে আদায় করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا»۔ (النساء : ١٠٣)

'নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর লিখা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে।' (নিসা ঃ ১০৩) অর্থাৎ নামায ফরয করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে।

বরং আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যারা তার পথে লড়াই করছে, শত্রুর মুকাবিলায় ব্যস্ত ও তৎপর তারা যেন যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সময় মত নামায আদায় করে নেয়। তাদেরকে নামায দেরীতে আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়নি! বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আমাদের উলামাগণ কতিপয় ফত্ওয়া দিয়েছেন ।

হে প্রিয় ভাই! আপনি দয়া করে তা শুনুন। শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন বলেন, যখন তাঁকে এ ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করেছিল- আপনার নামায হবে না। এ নামায কোন কাজে আসবে না যদিও আপনি তা আদায় করেন। কেননা, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে একে তার নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরীতে নিয়ে গেছেন। এ আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট আপনার তাওবা করা জরুরী। তিনি আরো বলেন যে, কতিপয় উলামা এ মত পোষণ করেন, কেউ যদি কোন রকম ওযর ব্যতিরেকে নামাযের নির্দিষ্ট সময় পার করে বিলম্বে তা আদায় করে তাহলে এ কারণেই সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ

«فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ»- (الماعون : ٤-٥)

'সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফিল।' (মাউন ঃ ৪-৫) অর্থাৎ তারা সময় মত তা আদায় করে না, আরকান-আহকাম মানে না।

আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এ কথা জানতে যে, নামাযের পাবন্দ হলে দুনিয়া ও আখিরাতে কি কল্যাণ লাভ হবে? আসুন তাহলে আমরা সকলেই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেই শুনি যা আমাদেরকে সময়মত নামাযে আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দানে উজ্জীবিত করে তুলবে, আল্লাহ নামাযের অতীব মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাকে ইসলামের খুটি বানিয়েছেন।

নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব

এক ঃ নামায হল দুনিয়ার ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষার কারণ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ" - (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। সুতরাং হে মানব সন্তান! তুমি লক্ষ্য কর যেন আল্লাহ তোমাকে তাঁর জিম্মা সম্পর্কে কোন কিছু যেন না চান।' (মুসলিম)

দুই ঃ জামায়াতে নামায গুনাহ মাফের কারণ হবে, যে গুনাহ থেকে কোন মানুষই নিরাপদ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّهِ لِيَقْضِىْ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّهِ ، كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهَا تَحِطُّ خَطِيْئَةً وَالأُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً "- (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর ঘরে ফরজ আদায় করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং অপর একটিতে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।' (মুসলিম)

তিন ঃ এটি আপনার ফিরিশতার দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করার কারণ হবে। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ مَالَمْ يَحْدُثْ ، تَقُوْلُ : اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اَللّهُمَّ ارْحَمْهُ "- (رواه البخارى)

'ফিরিশতারা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ তোমাদের কেউ তার নামায আদায়ের স্থানে অবস্থান করে যতক্ষণ না অযু ভঙ্গ হয়। তারা বলতে থাকে, হে প্রভু! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি রহম করুন।' (বুখারী)

চার ঃ এ হল আপনার শত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়, তাকে পরাভূত ও লাঞ্ছিত করার মাধ্যম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন ঃ

"مَامِنْ ثَلاَثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةُ"۔(رواه أبو داود)

'কোন গ্রামে বা প্রান্তরে যদি তিনজন লোক থাকে আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা না করে তাহলে শয়তান তাদের উপর চড়াও হয়। সুতরাং তোমরা জামায়াতবদ্ধ ভাবে থাকবে। কেননা নেকড়ে বিচ্ছিন্ন ছাগলকেই পাকড়াও করে।' (আবু দাউদ)

পাঁচ ঃ এটি কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর প্রাপ্তির কারণ হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"بَشِّرُوْ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "۔(رواه أبو داؤدوالترمذى)

'তোমরা কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও যারা রাতের অন্ধকারে মসজিদের পানে যাত্রা করে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ছয় ঃ জামায়াতে নামায পড়লে অনেক বেশী নেকী পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً "- (متفق عليه)

'জামায়াতে নামায আদায় করলে একাকী নামায আদায় থেকে সাতাশ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায়।' (বুখারী, মুসলিম)

সাত ঃ এর দ্বারা মুনাফিকীর একটি বিশেষণ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে কারণ মুনাফিকরা জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন ঃ

"لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْيَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا - أى من الأجر- لأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا"- (متفق عليه)

অর্থাৎ- 'মুনাফিকদের নিকট ফজর ও এশার নামাযের মত কষ্টের নামায আর নেই। যদি এরা এর নেকীর পরিমান জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'নামাযে হাযির হত।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমরা একমাত্র মুনাফেকদেরকেই জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে দেখতাম না। লোকজনকে এমন ভাবে আনা হত যে অন্যের কাঁধে ভর করে এসে জামায়াতে দাঁড়াত। (মুসলিম)

আট ঃ এটিই হচ্ছে মনের শান্তি অর্জনের সঠিক পথ এবং মানসিক রোগ হতে মুক্তির পথ, যে রোগে আজ বেশীর ভাগ মানুষ ভুগছে। যেমন- দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি, পারিবারিক বা ব্যবসায়িক অথবা অন্যান্য বিষয়ে ব্যর্থতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذْ هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّهَ انْحَلَّتْ عقُدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ"۔ (متفق عليه)

'যখন তোমরা ঘুম যাও শয়তান তোমাদের ঘাড়ের ওপরে মাথার দিকে তিনটি গিরা দেয়। প্রতি গিরা লাগানোর সময় সে বলে এখন অনেক রাত বাকী আছে, সুতরাং তুমি ঘুমাও। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাহলে একটি গিট খুলে যায়। যদি ওযু করে তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। যদি নামায আদায় করে তাহলে শেষ গিরা খুলে যায় এবং সে কর্মচাঞ্চল্য ও সুন্দর মনের অধিকারী হয়। তা না হলে অলস ও খারাপ মন নিয়ে তার সকাল শুরু হয়।' (বুখারী, মুসলিম)

নয় ঃ এটি জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ "- (متفق عليه)

'যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ে নামায আদায় করল সে যেন জান্নাতে প্রবেশ করল।' (বুখারী, মসলিম) তিনি আরো বলেন ঃ

"لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا"- (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি সূর্য্য উঠার পূর্বে এবং সূর্য্য ডুবার পূর্বে নামায আদায় করার সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না।' (মুসলিম) অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় করল।

প্রিয় ভাই! আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এসব হাদীস শুনার পর মনে মনে আপনার শত্রু শয়তানকে পদদলিত করার সংকল্প নিবেন এবং এসব ঘাটতি ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবেন এবং ভবিষ্যতে যেন আর জামায়াতের সাথে নামায আদায় পরিত্যাগ না করেন সে চেষ্টা করবেন, তবেই আপনার এ সংকল্প ঠিক থাকবে। এবার কিছু উপকারী গুণাবলীর বিষয় আপনার নিকট পেশ করছি।

কতিপয় আমলের আলোচনা

এক. ঈমানী আমলের কতিপয় মাধ্যম ঃ

এ ব্যাপারে আমলের অনেক প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল-

১। সুন্নাত ও নফল বেশী বেশী আদায় করার চেষ্টা করা

এটি একজন মানুষকে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে সহায়তা করে ... এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, বিতির নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা, চাশত নামায আদায় করা, দান-খয়রাত করা, নফল রোযা পালন ইত্যাদি।

২। সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করা

আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের আশায় এবং তার নিকট অপরাধের ক্ষমা চাওয়ার জন্য সর্বদা ক্ষমা চাইতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর গুনাহ না হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا ، وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا ، وَرَزَقَهُ مَنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ " - (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি সবসময় ইসতেগফার পড়বে (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করবে) আল্লাহ তাকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন এবং সব সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে এমন সব উৎস থেকে রিজিক দান করবেন সে কোন দিন যে উৎসের কথা কল্পনাও করেনি।' (আবু দাউদ)

৩। বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করুন

এতে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা, নফসের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য

লাভ হয়। এর দ্বারা শয়তানকে বিতাড়ন এবং কল্যাণ অনুগত্যের কাজে সহায়তা হয়। এটি কয়েক প্রকার। গুরুত্বপূর্ণ হল সকাল সন্ধ্যার দু'আ, বিপদাপদের দু'আ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পঠিতব্য দু'আ এবং সাধারণ দু'আ।

৪। সৎ পরিবেশে জীবন যাপন করা

সঠিক পথে থাকার জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে ব্যক্তি ভাল চায় এবং মন্দ থেকে দুরে থাকতে চায় তাহলে তাকে সেই খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে যারা নামায আদায় করে না বা নামাযের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে, অথবা গুনাহ ও খারাপ কাজে লিপ্ত। ভাল সঙ্গী খুজবে যারা কল্যাণকর কাজে সহায়তা করবে। যে এটা করতে সক্ষম হবে না, সে আল্লাহ্‌র দ্বীনের আনুগত্য পালনে দুর্বল হবে।

৫। দু'আর হাতিয়ারকে গুরুত্ব দেয়া:

প্রতেক মুসলমানের উচিৎ সে তার রব আল্লাহর নিকট বিনীত ভাবে কায়মন বাক্যে নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে। তাহলে আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ঠ হয়ে যাবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সব কল্যাণকর কাজে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। একজন মুসলমানের উচিৎ বেশী বেশী আল্লাহর নিকট দু'আ করা বিশেষ ভাবে সেসব সময় যখন দু'আ কবুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেন তাকে তিনি তার স্মরণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উত্তম ইবাদত করতে সাহায্য করেন এবং সব ধরনের গুনাহ হতে বাঁচান। এর দ্বারা সে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ ও সফলতা লাভ করবে।

দুই. অন্যান্য নির্দিষ্ট মাধ্যম ঃ

১। ঘুমাবার পূর্ব মুহূর্তে বিতিরের নামায আদায় করা।

২। দ্রুত পাক-সাফ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া।

৩। ঘুমাবার আগে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা।

৪। পরিবারের লোকদের বা কোন বন্ধুবান্ধবকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলে রাখা।

৫। ঘুমের দু'আ পড়া।

৬। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে যথা সম্ভব শরীরের উপর হাত বুলান।

পরিশেষে- আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করি যেন আল্লাহ্ আপনাকে এ সব কথার দ্বারা উপকৃত করান, এর মাধ্যমে যেন আপনি সঠিক চিন্তাধারায় ফিরে আসেন এবং আপনার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। সে পথে চলতে পারেন যে পথে রয়েছে আপনার কল্যাণ। সব খারাপ ও অন্যায়ের পথ পরিহার করতে পারেন, হারাম ত্যাগ করতে সক্ষম হন। আমার ধারনা আপনি তা করতে পারবেন। আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আপনাকে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার এবং সব ধরনের ভাল ও নেকীর কাজ করার তাওফীক দান করেন। আমীন॥

আমাদের সময়কে কিভাবে কাজে লাগাব ?

কেউ যদি লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং লক্ষ্য করে যে, তারা কিভাবে জীবন যাপন করছে, কিভাবে সময় ব্যয় করছে। তাহলে সে দেখতে পাবে যে, এদের অধিকাংশই নিজদের সময় বিনষ্ট করছে। এরা সময়কে ভাল কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এজন্য এদেরকে দেখবেন যে, এরা নিজদের সময় ও জীবনকে এমন কাজে ব্যয় করছে যাতে কোন ফায়দাই নেই।

অনেকেই এদের জীবনযাপন দেখে আশ্চর্যবোধ করে। এরা কীভাবে সময় নষ্ট করে? জীবন থেকে ফায়দা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। দেখা যায় এরা অনেকেই ফালতু ও বেহুদা কাজে বৃথাই সময় ও জীবন বিনষ্ট করছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছে, মূলত জীবন থেকে তা হারিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদেরকে কবরের পানে ধাবিত করছে।

আমরা তাদের জীবনাচার দেখে খুশী হচ্ছি

প্রতিটি মুহূর্তই জীবন থেকে ঝরে পড়ছে।

সময়ই জীবন। মানুষের প্রকৃত জীবনকাল হল সময়। সময়কে সংরক্ষণ করাই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ। একে নষ্ট করাই হচ্ছে সকল অকল্যাণের উৎস। এজন্য একজন মুসলমানের জীবনে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত এবং একথা যথাযথভাবে চিন্তা করে সময়ের ব্যাপারে এমন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন যাতে সময়কে ভাল কাজে লাগাতে পারে।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে দীর্ঘজীবি করেন, আমাদের আমলকে উত্তম করেন এবং সময় হতে সর্বত্তোম ফায়দা নেয়ার সুযোগ ঘটান।

সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব ঃ

মানুষ যখন কোন কিছুর মূল্য ও এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে তখণ সে চেষ্টা করবে যেন তা কোনভাবেই নষ্ট না হয়। আর এটি স্বতসিদ্ধ কথা। সুতরাং কোন মুসলমান যখন তার সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে তখন সে এ থেকে সর্বাত্তক ফায়দা নেয়ার প্রচেষ্টা চালাবে, যেন সে এর দ্বারা তার প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে পারে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রহঃ) একথাটি বিশ্লেষণ করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে সময়ই হল মানুষের জীবন। এ সময়ই তার চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এই সময়ই আবার মানুষকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে নিক্ষেপের কারণ হতে পারে। সময় মানুষের জীবনে মেঘমালার মত উড়ে যায়। সুতরাং যার সময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে সেটিই তার প্রকৃত জীবন। আর যদি অন্য পথে ব্যয় হয় তাহলে সময় তার জীবন থেকে বৃথা ঝরে পড়ল। কেউ যদি তার সময়কে শৈথিল্য, ভ্রান্ত আশা-আকাঙ্খা, ঘুম ইত্যাদিতে নষ্ট করল তার বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

ইবনে জাওযি (রহঃ) বলেন, মানুষের উচিত সে যেন তার যুগের মর্যাদা এবং সময়ের গুরুত্ব বোঝে। সে যেন একটি মুহূর্তকেও

আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী আমল ব্যতীত অন্য কাজে ব্যয় না করে। সে যেন ভাল ভাল কথা এবং কাজ সঠিক সময়ে সম্পাদন করে। তার নিয়ত যেন সর্বদা ভাল কাজের জন্য তৈরী থাকে।

কুরআন ও হাদীসে সময়ের বিভিন্ন দিককে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে সময়ের বিভিন্ন অংশের সাথে শপথ করেছেন। যেমনঃ রাতের, দিনের, ফজরের, প্রথম প্রহরের এবং যুগের। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَالَّيلِ اِذَا يَغْشى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّى»- (الليل : ١-٢)

"রাত্রির শপথ, যখন তা ঢেকে নেয় এবং দিনের শপথ, যখন তা প্রকাশ পায়।" (লাইল ঃ ১-২)

«وَالفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ»- (الفجر : ١-٢)

"ফজরের শপথ এবং দশ রাত্রির শপথ।" (ফজর ঃ ১-২)

«وَالضُّحى - وَالَّيْلِ اِذَا سَجى »- (الضحى : ١-٢)

"শপথ, মধ্য দিনের, শপথ, রাত্রির যখন তা গভীর হয়।" (যোহা ঃ ১-২)

«وَالْعَصْرِ - اِنَّ الانْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ »- (العصر : ١-٢)

"যুগের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত।" (আসর ঃ ১-২)

আর এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর নামে শপথ করলে সে জিনিসটির গুরুত্ব ও মর্যাদাই প্রমাণিত হয়। তাই আল্লাহ সময়ের শপথ করাতে এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাদীস শরীফে সময়ের গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। অনেক হাদীসেই একথা উল্লেখ রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সময় সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

"لاَ تَزُوْلُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ" - (رواه الترمذى وحسنه الألبانى)

"কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পা উঠিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। সে জীবনকে কিভাবে অতিবাহিত করেছে, যৌবনকালকে কোন পথে ব্যয় করেছে। ধনসম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে এবং জ্ঞান পেয়ে কিভাবে আমল করেছে।" (তিরমিযী, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অবিহিত করেছেন) নবী করীম (সঃ) সময় সম্পর্কে বলেছেন

যে, এটি খুবই মূল্যবান এক নিয়ামত। এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা দরকার। এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তা কেড়ে নেয়া হতে পারে। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো, একে আনুগত্যের পথে ব্যয় করা এবং অনন্ত পরকালের পথে একে বিনিয়োগ করা। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ

"نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ" - (رواه البخارى)

"দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেককেই হিংসা করা হয়ে থাকে, সুস্থতা ও অবসর।" (বুখারী)

সময়ের ব্যাপারে একজন মুসলমানের কর্তব্য

সময়ের এত গুরুত্ব যে একেই জীবন বলে অবহিত করা হয়েছে। এজন্য একজন মুসলমানের উপর অপরিহার্য হলো এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এ থেকে পূর্ণ ফায়দা নেয়া ঃ

১. সময় থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকা ঃ মানুষ যেমন ধনসম্পদের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকে তেমনি একে হেফাজত করার জন্যও সদা তৎপর থাকে। সে জানে যে, সম্পদ আসে আবার চলে যায়। সুতরাং অবশ্যই তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে সময় থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য, যাতে তার ইহকাল ও পরকালে উপকারে আসে। কেননা সময় চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। আমাদের সালফে সালেহীনগণ সময়কে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই তৎপর, তাদের কোন একটি সময়ও

যেন জ্ঞানার্জন, সৎকাজ বা নিজের নফসের উন্নতি অগ্রগতি কিম্বা অপরের কল্যাণ মূলক কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় না হয়। হাসান (রহঃ) বলেন; আমি অনেক সম্প্রদায়কে পেয়েছি যারা তোমাদের টাকা পয়সার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার চেয়ে বহুগুণ বেশী সচেষ্ট ছিলেন নিজেদের সময়কে ভালকাজে ব্যয় করার ক্ষেত্রে।

২. সময়কে নিয়ন্ত্রন ও সুশৃংখলিত করা ঃ একজন মুসলমানকে অবশ্যই তার সময়কে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। একে দুনিয়ার ও আখেরাতের কাজে সুশৃংখলিত করতে হবে, যেন এক কাজ করতে গিয়ে অন্যটা বাধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। একটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যটিকে গুরুত্বহীন না করে দেয়।

একজন নেকার বান্দা বলেন ঃ বান্দার সময় চারটি, পাঁচটি নয় ঃ নিয়ামতের, বিপদাপদের, আনুগত্যের এবং গুনাহের। আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে ইবাদতের কাজে লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে। কারো সময় যদি আনুগত্যের সময় হয়, তাহলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অনুদান, কারণ তিনি তাকে সৎপথ দেখিয়েছেন। যার সময় যাচ্ছে নিয়ামতের মাঝে, তাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। যার সময় যাবে গুনাহের মাঝে তাকে তাওবা করতে হবে এবং যার সময় যাচ্ছে বিপদাপদের মাঝে, তাকে অবশ্যই আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থেকে সবর এখতিয়ার করতে হবে।

৩. অবসর সময়কে কাজে লাগান ঃ অবসর একটি নিয়ামত অথচ এ ব্যাপারে অনেকেই বেখবর। অনেককে দেখা যায় যে, এরা এর শুকরিয়া আদায় করছে না এবং এর মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করছে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সঃ) সময় সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলেন ঃ

"اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ ... وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ"- (رواه الحاكم وصححه الألبانى)

"তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো। ....তোমাদের অবসর সময়কে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বে। (হাকেম, আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।)

একজন নেককার বান্দা বলেন ঃ কাজ থেকে অবসর থাকা একটি বিরাট নিয়ামত। কোন বান্দা যদি এই নিয়ামতের কুফরী করে নিজের কামনা-বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং কুপ্রবৃত্তির পিছনে ধাবিত হয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তঃকরণে নিয়ামতকে বিষিয়ে তুলবেন এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা বিলোপ করবেন।

একজন জ্ঞানবান ব্যক্তির উচিৎ সে যেন তার অবসর সময়কে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে, নতুবা এই অবসর নামক নিয়ামতটি তার জন্য আযাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে ঃ পুরুষের জন্য অবসর হল শৈথিল্যতা আনয়নকারী আর মহিলাদের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী।

সময়কে কাজে লাগানোর সহায়ক বিষয় ঃ

১. আত্মসমালোচনা করা ঃ সময় আনুগত্যের কাজে লাগাবার এটি একটি উত্তম মাধ্যম। এটি সৎ ও খোদাভীরু লোকদের পথ। প্রিয় মুসলিম ভাই! এজন্যই আপনার নিজের হিসেব করুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, আজকে আপনি কি কাজ করেছেন? সময় কিভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং কোন কাজে ব্যয় করেছেন? আজ কি আপনার নেকীর খাতায় কিছু যোগ হয়েছে নাকি গুনার খাতা ভারী হয়েছে?

২. আত্মাকে উচ্চতর সংকল্পের জন্য প্রস্তুত করা ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে উচ্চতর কাজকর্মের জন্য তৈরি করবে সে অবশ্যই সময়কে কাজে লাগাতে পারবে। কেননা সংকল্পকারীর সংকল্প মোতাবেকই কাজকর্ম সম্পাদিত হয়।

কবি বলেন ঃ মানুষের আশা যদি উচ্চতর না হয়
তাহলে মূলহীন বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

৩. যারা সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল তাদের সঙ্গ গ্রহণ করা ঃ কেননা এদের সাথে চলাফেরা, উঠাবসা করলে এরা সময়কে কাজে লাগাতে সহায়তা করতে পারেন এবং জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করা সহজ হবে।

কবি বলেন,

যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে থাকো তাহলে
তাদের ভাল লোকদের সঙ্গ নাও।

নীচু লোকদের সঙ্গ নিওনা,

নতুবা নীচেই পড়ে থাকবে।

কোন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে তার

সঙ্গীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর।

কেননা কোন ব্যক্তিকে সঙ্গীকে সাথী দ্বারাই

মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

৪. সালফে সালেহীনদের অবস্থা জানা এবং তাদের জীবন চরিত থেকে সময়ের ব্যাপারে তাদের অবস্থা অবগত হওয়াঃ কেননা সময়কে কাজে লাগনোর ব্যাপারে তাদের পদক্ষেপ সমূহ আমাদেরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁরাই হচ্ছেন আমাদের সর্বোত্তম অনুকরণীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

৫. সময়কে কাজে লাগাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করা। কেননা কোন লোক যদি একই ধরনের কাজ করতে থাকে তাহলে তার মন বিরক্ত হয়ে পড়ে। মনে অনিহার সৃষ্টি হয়। এজন্যই বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে সময়কে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে, যেন কাজে নতুনত্ব আসে।

৬. একথা ভালভাবে অনুধাবন করা যে, সময় চলে গেলে তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়ঃ প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে, একে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। হযরত হাসান (রহঃ) এ অর্থেই বলেন ঃ প্রতিদিন আদম সন্তানকে ডেকে

ডেকে বলা হয়ে থাকে, হে আদম সন্তান! আমি আজ তোমার জীবনে নতুন একটি দিন এবং তোমার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য। আমি চলে গেলে আর ফিরে আসবো না। সুতরাং যা আজ করবে তা অবশ্যই তুমি পরকালে পাবে। আর যে কাজটি করতে বিলম্ব করবে, সেদিন কক্ষণো তোমার জীবনে ফিরে আসবে না।

৭. মৃত্যুর কথা স্মরণ করাঃ মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা যখন মানুষ দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের পথে পা বাড়ায় আর কামনা করে, যদি আরেকটু সময় দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই সে ভাল কাজ করে নিত, জীবনের ভুলের মাশুল আদায় করত। কিন্তু হায়! কাজের সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন হিসেব দেয়ার সময় এসে গেছে। এসময়ের কথা স্মরণ করলে মানুষ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজ করতে যত্নবান ও আগ্রহী হবে।

৮. সময় বিনষ্টকারীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকাঃ অলস ও সময় অপচয়কারীদের সাথে থাকলে প্রকৃত পক্ষে জীবনী শক্তিকেই ধ্বংস করা হয়। মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে তার সঙ্গীদের দ্বারা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা কোন লোককে তার সঙ্গী সাথীর দ্বারা মূল্যায়ন কর। মানুষতো তাকেই সাথী বানায়, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

৯. একথা স্মরণ করা যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যখন মানুষ মহান পরাক্রমশালী রবের সামনে দাঁড়াবে সেই ভয়ংকর দিনে তাকে প্রশ্ন করা হবে তার জীবনও সময়

সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করে ছিল? কি কাজে ব্যয় করেছিল? রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "কোন বান্দা তার পা উঠিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। জীবন কিভাবে শেষ করেছ? যৌবনকে কোন পথে ব্যয় করেছে? .... (তিরমিযী, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।)

সময়ের ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের অবস্থান ঃ

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি মাত্র কয়েক দিনের জন্য এসেছো। যদি একদিন পার হয়ে যায় তাহলে তোমার জীবনের কিছু অংশ চলে গেল। তিনি আরো বলেন ঃ হে আদম সন্তান! দিন তোমার নিকট মেহমান স্বরূপ, সুতরাং তাতে ভাল কাজ করো। যদি তুমি ভালকাজ করো তাহলে চলে যাবার সময় তোমার প্রশংসা করবে আর যদি খারাপ কাজ কর তাহলে তোমাকে ভৎসনা করবে। রাতও একই রকম। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া হল তিন দিনের। গতকাল- সে তে চলেই গেছে, আগমীকাল- তা তুমি নাও পেতে পার এবং আজ- এটি তোমারই জন্য, সুতরাং একে আমল করে ভরে তোল। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে দিন চলে যায় তার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি আফসোস করি। এতে আমার আয়ুস্কাল কমে গেল কিন্তু এতে আমল বৃদ্ধি পায়নি।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম বলেন ঃ সময় অপচয় করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। সময়ের অপচয় তোমাকে আল্লাহ ও পরকাল থেকে দূরে

সরিয়ে দিচ্ছে। আর মৃত্যু তোমাকে কেবল মাত্র দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়।

সিরী ইবনে মুফলেহ বলেন ঃ

তোমার সম্পদ কমে গেলে তুমি চিন্তা কর, তোমার আয়ুস্কাল কমে যাচ্ছে, সুতরাং তুমি কান্নাকাটি কর।

কিভাবে সময়কে বিনিয়োগ করবো

সময়কে কাজে লাগাবার ক্ষেত্র অনেক। একজন মুসলমানকে সেটিই গ্রহণ করা উচিৎ যা তার জন্য মানান সই হয় তন্মধ্যে উত্তম ও উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. কুরআন মজীদ মুখস্ত করা এবং তার শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত থাকা। নবী-করীম (সঃ) কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেন ঃ

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"-(رواه البخارى)

“তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারী)

২. ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ঃ আমাদের সালফে সালেহীনগণ ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। তারা মনে করতেন যে, তাদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন খানাপিনার চেয়েও বেশী। জ্ঞানার্জনের অনেক পথ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো ঃ আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়া, উপকারী ক্যাসেট শোনা, ভাল বই পড়া ও তা ক্রয় করা।

৩. সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করে দু'আ পাঠ করা। এতে তেমন কোন কষ্ট করারও প্রয়োজন পড়ে না। নবী করীম (সঃ) তাঁর সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করে বলেন ঃ "তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহর স্মরণে সর্বদা সিক্ত থাকে।" (আহমাদ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।) বান্দা তার প্রভুর কথা সর্বদা স্মরণ করবে। যদি কথা বলে তবুও স্মরণ করবে, যদি কোথায় যায় তবুও তাঁকে স্মরণ করবে, কোন কাজ করার প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতেও তাঁকে স্মরণ করবে।

৪. বেশী বেশী নফল নামায আদায় করা ঃ সময়কে কাজে লাগাবার এটি এক সর্বোত্তম উপায়। নফল বেশী বেশী আদায় করলে তা দ্বারা যদি ফরজের কোন ঘাটতি থাকে তা পূরণ করা হবে। এছাড়াও এর দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য ও ভালবাসা লাভে ধন্য হবে। মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন ঃ

"وَلاَ يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" - (رواه البخارى)

"বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে আমি ভালবাসি।" (বুখারী)

৫. আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া, সৎকাজের আদেশ, খারাপ কাজে নিষেধ করা এবং মুসলমানদেরকে দ্বীনের জন্য সৎ উপদেশ দেয়া সময়কে কাজে লাগাবার সর্বোত্তম উপায়। আল্লাহর পথে দাওয়াত

হলো নবী-রাসূলদের সুন্নাত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْآ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ»- (يوسف : ١٠٨)

"বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর পথে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরাও। (ইউসুফ ঃ ১০৮)

সুতরাং প্রিয় ভাই! আপনি আপনার সময়কে দাওয়াতের কাজে লাগাবার চেষ্টা করুন, আলোচনা সভার ব্যবস্থা করুন, আলোচনা রাখুন, বইপত্র, ক্যাসেট বিতরণ করুন, বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশী এবং অন্যান্যদেরকে দ্বীন ইসলামের পথে আহ্বান করুন।

৬. আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা ঃ এটি জান্নাতে প্রবেশ, রহমত লাভ ও আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক এক কর্ম এবং এর দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়। নবী-করীম (সঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি চায় তার রিযিক বৃদ্ধি করা হোক এবং তার চলার পথ সহজ করা হোক তাহলে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রগাঢ় করে।" (বুখারী)

৭. দিনের সর্বোত্তম সময়গুলোকে কাজে লাগান ঃ যেমন নামাযের পর, আযান ও ইকামতের মাঝের সময়, রাতের শেষ প্রহর, আযান শুনার সময়, ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদয় হবার সময় পর্যন্ত, এ সময়গুলোতে আমল করলে অবশ্যই বেশী বেশী নেকী লাভের সৌভাগ্য ঘটবে এবং সময়কে সর্বোত্তম কাজে ব্যয় করা হবে।

৮। জন কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করাঃ এ কাজে সময় লাগানো যেমন কোথাও বিদ্যুৎ পৌছানোর জন্য চেষ্টা করা বা কাউকে ব্যবসায়িক সহায়তার চেষ্টা করা বা জনগণ যাতে উপকৃত হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকা যেমন কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি, যার দ্বারা সে নিজে এবং তার অপরাপর মুসলমান ভাই উপকৃত হন।

সুপ্রিয় ভাই! আমরা এখানে সময়কে বিনিয়োগ করার কতিপয় খাতের উল্লেখ করে ছিলাম মাত্র। কেননা কল্যাণ ও উপকারের খাতের কোন শেষ নেই। আপনি একটু উদ্যোগ নিলেই সময়কে সঠিক পথে ভাল খাতে লাগাতে পারেন, নিজেও উপকৃত হবেন অন্যরাও ফায়দা পাবে।

সময় বিধ্বংসী রোগ

বেশ কিছু রোগ রয়েছে যা একজন মুসলমানের সময়কে ধ্বংস করে দিয়ে জীবনকে বরবাদ করে দিচ্ছে। এসব রোগের মাঝে অন্যতম হচ্ছে ঃ

১. শৈথিল্য ঃ এ এক মারাত্মক বিপজ্জনক রোগ যা অনেক মুসলমানের সময়কে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা শৈথিল্য ও গাফলতী সম্পর্কে চরমভাবে সর্তক করেছেন পবিত্র কালামে পাকে। যারা শৈথিল্য করবে গাফলতি করবে, তাদেরকে জাহান্নামের লাকড়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالانْسِ ذ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَيَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُوْلٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ »۔ (الاعراف : ١٧٩)

"আমরা সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না, তারা চতুস্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল শৈথিল্য পরায়ন। (আ'রাফ ঃ ১৭৯)

২. ধীরে চলার কৌশল গ্রহণ ঃ এর ফলে অনেক লোকের সময় নষ্ট হয় জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। অনেকের নিকট 'পরে দেখা যাবে' শব্দটি মজ্জাগত হয়ে গেছে। কোন কাজ এলেই বলে পরে করবো, পরে দেখা যাবে, এখন থাক ইত্যাদি। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, 'সাবধান আপনি পরে করবো একথা কক্ষণও বলবেন না। কেননা আপনি আজকে আছেন, কালকে নাও থাকতে পারেন।' এজন্যই ভাই কোন কাজকেই পরে করবো বলবেন না, কেননা আপনি যে, আগামী কাল পর্যন্ত বাঁচবেন এ রকমের কোন নিশ্চয়তা নেই। যদিও বাঁচেন তবুও বলা যায় না কোন বিপদাপদ, বালা মুসিবত, জরুরী কাজকর্ম এসে পড়ে কিন, যাতে আপনি দম ফেলারও ফুরসত পাবেন না।

তাকওয়া অবলম্বন করুন, কেননা আপনিতো জানেন না রাত্রি এসে গেলে এরপর কি আপনি ফজর পর্যন্ত বাঁচবেন? কত সুস্থ মানুষ এমনিতেই মারা গেল আর কত অসুস্থ মানুষ যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। কত খারাপ লোক বহুদিন হায়াত পেয়েছে আর কত ভাল যুবক পথ চলছে অথচ জানেনা তার কাফনের কাপড় তৈরী হয়ে রয়েছে।

হে মুসলিম ভাই! সময়কে নেকীর কাজে ব্যয় করুন, ভাল কাজে লাগান। আজ কাল করে সময়কে অপচয় করবেন না। সময়ের তরবারী সবাইকে কেটে যাবে। তাই সে কাটার পূর্বেই নিজের কর্তব্য সেরে ফেলুন। আমরা যেন সময়ের শিকারে পরিণত না হই।

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তার বংশধর ও সাহাবাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক।

رسائل توجيهية

محتويات الكتاب

مطابع الحميضي ت 4581000 ف 4592217 الرياض

رسائل توجيهية

باللغة البنغالية

إعداد
اللجنة العلمية بالدار

ترجمة
محمد شمعون علي

مراجعة
زين العابدين عبد الله
شيخ محسن علي

رسائل توجيهية

إعداد :
القسم العلمي في الدار

ترجمة :
محمد شمعون علي

ردمك: ١ ـ ٥ ـ ٩٥٤٩ ـ ٩٩٦٠